# মরণফাঁসি

মাসউদ

# মরুসিংহ

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

মাসউদ

মদীনা পাবলিকেশান্স
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
শাখা ঃ ৫৫বি পুরানা পল্টন (দোতালা), ঢাকা-১০০০

যাঁরা অন্যায়ের
প্রতিবাদে– সত্য প্রতিষ্ঠায়
লড়ে গেছেন ও যাচ্ছেন,
তাঁদের জন্য।

অভিশপ্ত জাতিকে তাড়াতে—
আর কুরআনকে রক্ষা করতে
আমি লিবিয়া যাব আনন্দ চিত্তে।
মা! তুমি কেঁদো না
আমি মারা গেলে।
"শোক পালন করছ না কেন?"
— যদি কেউ জানতে চায়।
বলো—
প্রাণ দিয়েছে সন্তান আমাদের
উড়াতে ঝাণ্ডা পবিত্র ইসলামের।
(ইতালী-সাহিত্য অবলম্বনে)

# অবতরণিকা

১৯৬২ সালে লিবিয়ার এক সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্ম নিয়েছিল এক শিশু! কিন্তু তখন কি কেউ জানত— সেই শিশু একদিন কালজয়ী বীর হবে!

অন্য আর একটি শিশুর থেকে কিছুটা ব্যতিক্রমভাবে গড়ে উঠলো এতীম এই শিশু। শান্ত-শিষ্ট, ভদ্র ও জ্ঞান পিপাসু এই শিশু সকলের মন জয় করলো অল্প দিনেই। অর্জন করলো অগাধ পাণ্ডিত্য। শুরু করলেন শিক্ষকতা।

চলছিলো বেশ। অকাতরে জ্ঞান দান, মানুষকে সত্যের পথ দেখানো। ভেবে ছিলেন তিনি— সারাটা জীবন এভাবেই কাটিয়ে দিবেন। কিন্তু তা আর হলো না। লিবিয়ার আকাশে অশনি সংকেত দেখা দিলো। ১৯১১ সালে ইতালীরা লিবিয়াতে প্রবেশ করলো। নিরীহ মানুষের উপর তাদের অত্যাচার উৎপীড়ন বর্ণনাতীতভাবে বেড়ে গেল।

ধৈর্যের বাধ টুটে গেল অনেকের। শান্ত-শিষ্ট, ভদ্র ও জ্ঞান সাধক এই স্কুল মাস্টারেরও ধৈর্যের বাধ টুটে গেল। চক ও লাঠির পরিবর্তে তাঁর হাতে উঠে এলো রাইফেল, মেশিনগান। তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন আগ্রাসী ইতালীদের উপর। একের পর এক অভিযান পরিচালনা করে ইতালীদেরকে নাস্তানাবুদ করে দিলেন। দিনে দিনে হয়ে উঠলেন অসীম সাহসী কালজয়ী বীর "মরুসিংহ" ওমর মুখতার।

ওমর মুখতার একটি ইতিহাস— একটি উপাখ্যান। কোন প্রলোভন তাকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি। প্রতিকুলতা নুয়ে দেয়নি। ক্ষিপ্রতা ও সাহসিকতায় তিনি ছিলেন সিংহের ন্যায়। তাঁর ঈমান ছিল সীসা ঢালা প্রাচীরের মত মজবুত ও অটুট। আর আদর্শ ছিল বিশ্বনবী। কুরআন ছিল দিক নির্দেশনা। তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে— অন্যায়ের প্রতিরোধে। মরুহিংহ তিনি সেই "ওমর মুখতার"।

ওমর মুখতারের জীবনী নিয়ে আমার উপন্যাস লেখার খেয়াল জাগে ১৯৮৯ সালের দিকে। আমি তখন মিসরের আল-আজহার বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র। লিখবো লিখবো করেও লেখা হয়ে উঠেনি। তথ্য ও লিবিয়া সম্পর্কে সম্যক ধারণার অভাবে। এর মধ্যে দেশে ফিরে আসি। দীর্ঘ দিন আরব দেশে থাকার ফলে লিবিয়া সম্পর্কে বিশেষ করে ওমর-মুখতার সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মে। কিন্তু তার পরও লেখা হয়ে ওঠে না। লিখতে বসে হারিয়ে ফেলি। বেশ কিছুদিন লেখা স্থগিত থাকে। এরমধ্যে মুসলিম জাহানের ঈদুল ফিতর—২০০০

সংখ্যায় একটি উপন্যাস পাঠানোর জন্য শ্রদ্ধেয় সম্পাদকের কাছ থেকে একটি চিঠি আসে। কিন্তু নানাবিধ কারণে লেখা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই ঈদুল আযহা ২০০১-এ ছাপান হয়। পরবর্তীতে মুসলিম জাহান সম্পাদক জনাব মোস্তফা মঈনউদ্দীন খান এটিকে বই আকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য তাঁর নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ। সত্যি কথা বলতে– বিভিন্ন সময়ে তিনি আমাকে লিখতে যেমন উৎসাহিত করেছেন, তেমনি অনুপ্রাণীতও করেছেন।

ঘটে যাওয়া সব ঘটনা সত্য হলেও তার বাস্তবায়ন দেখাতে অনেক সময় কিছু চরিত্র টেনে আনা হয়েছে। এই চরিত্রের পিছনে ঐতিহাসিক সত্য না থাকলেও ঘটনার পিছনে ঐতিহাসিক সত্যতা বিদ্যমান।

বইটি দ্রুত লেখা সম্পন্ন করার পিছনে যার অনুপ্রেরণা অনেকখানি কাজ করেছে, তিনি আমার স্ত্রী। আল্লাহ তাকে মঙ্গল দান করুন।

সেই সাথে ডাঃ আবদুর রাজ্জাক ও ডাঃ মনজুরুল হাসানকে ধন্যবাদ না জানালে অনেকটা কৃপণতা প্রকাশ পাবে। কেননা তাঁরা আমাকে বিভিন্ন সময়ে তথ্য ও অনুপ্রেরণা দিয়ে সহায়তা করেছেন।

বইটি পড়ে কেউ উপকৃত হলে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কিঞ্চিত সার্থক হয়েছে মনে করবো।

**মাসউদ**

২৬/০৩/০১ ইং

মাহা কম্পিউটার ও অনুবাদ কেন্দ্র
৩১, মুজিব সড়ক, যশোর

॥ ১ ॥

দিগন্ত জোড়া ধূসর নীল আকাশ। তার কোলে নির্দয় সূর্য স্বতেজে দীপ্তমান।

নিচে খৈ ফোটা তপ্ত বালু। ক্ষণে ক্ষণে লু-হাওয়া বইছে প্রকৃতি কাঁপিয়ে। তার ঝাপটায় গরম বালু উপরে উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। দূরে বহু দূরে ধূসর রুক্ষ পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে। প্রতিকূল এই পরিবেশে একদল ঘোড় সোয়ার এগিয়ে চলেছে। সর্বগ্রে তাদের নেতা। সত্তুর ঊর্ধ্ব এক সৌম্য কান্তি বৃদ্ধ। দেহে যৌবনের দীপ্ততা। মুখ ভরা বরফের মত সাদা চাপদাড়ি। তীক্ষ্ম চোখে ছোট গোল চশ্‌মা। কাঁধে রাইফেল। গায়ে সাদা জাল্লাবিয়া। (আমাদের দেশে যাকে জুব্বা বলে) মাথায় পাগড়ি।

পথ চলা কঠিন হয়ে পড়েছে ক্রমেই। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে সকলের। স্বাস্থ্যবান তাজী ঘোড়ার মুখ দিয়ে ফেনা ঝরছে অবিরাম। তারা ক্লান্ত।

ক্লান্ত ঘোড়ার পিঠে বসা মানুষগুলোও। প্রভু ভক্ত ঘোড়াগুলো তবুও প্রাণপণে ছুটে চলেছে। মনিবের সমূহ বিপদ তারা বুঝতে পেরেছে।

ঘোড়ার গতি ক্ষান্ত হলো হঠাৎ। এক লাফে নেমে পড়লেন দলনেতা। সাথীরাও নেমে পড়লো একে একে। ঘোড়ার বুকে পিঠে থাপ্পড় দিয়ে আদর করলেন তিনি। ক্ষীণ হ্রেষা রবে মাথা নেড়ে তার প্রতিউত্তর দিলো ঘোড়া। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দলনেতা দৃষ্টি মেলে ধরলেন বহু দূরের ধূসর পাহাড়ের দিকে। কয় সেকেন্ড কি ভাবলেন তিনি। তারপর পিছন ফিরে সাথীদের বললেন,

ঃ এদিকে।

ঃ ওরা এখনো আমাদের পিছু ছাড়েনি। বয়স্ক এক সাথী মন্তব্য করলেন।

মাথা ঝাকালেন দলনেতা।

ঃ ওরা ক্ষ্যাপা কুকুরের ন্যায় হন্যে হয়ে উঠেছে।

ঃ কুকুরের সাথে খুব বেশি পার্থক্য নেই ওদের।

ঃ আমরা এখন কি করবো?

উত্তর দিলেন না দলনেতা। সতর্কতার সাথে কান খাড়া করলেন। লু-হাওয়ার শন্‌শন্‌ শব্দের সাথে মোটর যানের শব্দ ভেসে আসছে। সকলেই কান খাড়া করলো। শব্দ এদিকেই আসছে। দল-নেতার দিকে তাকালেন তারা। নীরব জিজ্ঞাসা সকলের চোখে-মুখে। আমরা কি প্রস্তুত হবো!! দলনেতা সকলের মুখের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। তারপর না সূচক মাথা নেড়ে বল্‌লেন–

ঃ ওরা সংখ্যায় অনেক বেশি।

ঃ কিন্তু আম------। উঠতি বয়সের এক যুবক মুখ খুললো। তিনি হাত উঠিয়ে তাকে ক্ষান্ত করলেন। তারপর বললেন,

ঃ বীরত্ব প্রকাশের অবস্থা নয় এখন।

আবার পথ চলা শুরু হলো। তবে ঘোড়ায় চড়ে নয়। পায়দলে। তারা হাঁটছেন মধ্যম গতিতে। বাতাসে উড়া দলনেতার পাগড়ির বর্ধিত অংশ কামড়ে ধরলো ঘোড়া। দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। ঘোড়া তাঁর গায়ে মাথা ঘষে আনুগত্য প্রকাশ করলো। মাথায় হাত বুলিয়ে ঘোড়াকে আদর করলেন তিনি।

পায়ে পায়ে তারা উঁচু বালুর টিবির উপর উঠলো। কোমরে ঝুলানো লম্বা চোঙা দূরবীণ চোখে ধরলেন দলনেতা। তিনটি ট্যাঙ্কসহ অসংখ্য মোটরযান তাদের দিকে ধেয়ে আসছে লাইন ধরে।

ঃ অনেক কাছে এসে গেছে।

ঃ আমরা এখন কি করবো?

ঃ ওদেরকে ধোকায় ফেলতে হবে।

ঃ কিভাবে?

ঃ মামুন, হামাদা, ফুয়াদ ও আসাদ– তোমরা চারজন এই লম্বা বালুর টিবির অপর প্রান্ত আড়াল করে সোজা পূর্ব দিকে চলে যাও। দ্রুততার সাথে যাবে।

কিছুদূর গিয়ে টিবির উপরে উঠে ওদের দিকে গুলি ছুঁড়বে। তোমাদের দিকে ওদের গতি পরিবর্তন হলে তোমরা দ্রুত ফিরে আসবে। আমরা এখানেই অপেক্ষা করবো।

ধোকায় কাজ হলো ভাল। শত্রুদের গতি পরিবর্তন হল। ওরা আবার পথ চলতে শুরু করলো। দলনেতা জাল্লাবিয়ার পকেট হতে মাছহাফ (কুরআন) বের করে পড়তে থাকলেন। এক হাতে ঘোড়ার লাগাম। অন্য হাতে মাছহাফ। পাগড়ির দুধারে মুখ ঢাকার জন্য ঝুলে থাকা কাপড় বাতাসের ঝাপটায় চোখে উড়ে এসে কুরআন পাঠে বাধা সৃষ্টি করছে।

তিনি সেটি সরিয়ে দিয়ে আবার পড়ছেন। অত্যন্ত দরদভরা কণ্ঠে তিনি পড়ে চলেছেন–

হে মুমিনগণ! সতর্কতা অবলম্বন কর; অতঃপর দলে দলে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হও। অথবা একসংগে মিলে অগ্রসর হও।

তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা (যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে) গড়িমসি করবেই-

সুতরাং যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রি করে, তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করুক। আর আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে কেউ নিহত অথবা বিজয়ী হলে অচিরেই তাকে মহা পুরস্কার দান করবো।

তোমাদের কী হলো যে, তোমরা সংগ্রাম করবে না আল্লাহর পথে এবং অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্যে, যারা বলে–

হে আমাদের প্রতিপালক! এই অত্যাচারী জনপদ হতে আমাদেরকে অন্যত্র নিয়ে যাও। আর তোমার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক বা নেতা কর এবং তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের সহায় করে দাও।

কুরআন পাঠ বন্ধ করে মুছহাফটি পকেটে রাখলেন দলনেতা। তারপর জিনে পা রেখে এক লাফে ঘোড়ার পিঠে উঠলেন। এভাবে বেশিক্ষণ পায়ে চলা যেমন নিরাপদ নয়, তেমন কঠিনও।

ঃ সাইয়্যেদ ওমর! এখন আমরা কোন দিকে যাব? বয়ঃবৃদ্ধ সাথীটি জানতে চাইলেন।

ঃ আপাতত সামনের কবিলাতে।

শান্তস্বরে উত্তর দিলেন সাইয়্যেদ ওমর। তার পর জিনে চাপ দিয়ে ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিলেন।

নির্দেশ পেয়ে ঘোড়া ছুটে চলল উল্কা গতিতে।

তার ক্ষুরের আঘাতে মরুর তপ্ত বালু বাতাসে লুটোপুটি খেতে লাগলো। কিন্তু তারা কি জানে– সামনের কবিলায় এখন কি ঘটছে?

প্রিয় পাঠক! এই সেই ওমর– অবিসংবাদিত নেতা– ওমর মুখতার। যিনি নিজেই হলেন একটি ইতিহাস। বর্বর ইতালীদের অন্তরে ভয় সৃষ্টিকারী মরুসিংহ। যিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন অন্যায়ের প্রতিবাদে– ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। কোন প্রলোভন তাঁকে লক্ষ্যচ্যুত করেনি। প্রতিকূলতা তাকে নুয়ে দেয়নি। বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, ক্ষিপ্রতা ও সাহসিকতায় যিনি ছিলেন সিংহের থেকেও অধিক। যার ঈমান ছিল সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় মজবুত ও অটুট। যার আদর্শ ছিল মহানবী (সা.)। কুরআন ছিল দিকনির্দেশনা। বুকে ছিল অসীম সাহস। দৃঢ় ছিল মনোবল। তিনি কখনো নুয়ে যাননি, ভেঙেও পড়েননি। মরুসিংহ সেই ওমর মুখতার।

## ॥ ২ ॥

গ্রামটির দৃশ্য বেশ মনোরম। অদূরে ধূসর বর্ণের পাহাড়। তার পাদদেশে ছোট-বড় খেজুর গাছ। সারিসারি কখনো। কখনো অবিন্যস্ত– বাচ্চাদের অকারণে হাঁটার মত। গাছের মাথায় থোকা থোকা কাঁদি। তাজা খোরমার ভারে নুয়ে পড়েছে কোনটি। কোন কাঁদির রং হলুদ। কোন কাঁদির রং লাল। কিছু দিনের মধ্যেই খেজুর পাড়ার ধুম পড়বে। তখন আনন্দের বন্যা বইবে চতুর্দিকে, ঠিক নবান্নের মত।

সকালের নরম আবরণ ভেদ করে সূর্য সবেমাত্র দ্বি-প্রহরে প্রবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছে। বাচ্চারা খেলায় মেতে উঠেছে। গোল্লাছুট খেলছে কেউ। কেউ দিচ্ছে

দৌড় প্রতিযোগিতা। ঘোড়া ও গাধার পিঠে চড়ার কসরত করছে একটু বড়রা। বাচ্চাদের সাথে তাল মিলিয়ে নানা রঙের পাখি একগাছ থেকে সে গাছে নাচা-নাচি করছে।

মরিয়াম, সবরিন, নাহিদাসহ আরো অনেকে পানি নিতে এসেছে। কারো হাতে মোশক। কারো কাখে সোরাহী। অনেকের কাখে কলসীও। ওরা সকলেই প্রায় সমবয়সী। চৌদ্দ থেকে ষোল-এর মধ্যে বয়স। দেহ ভরা পুষ্ট যৌবন। মরিয়ম সকলের থেকে সুন্দরী। গ্রামের মধ্যখানে পাথর দিয়ে উঁচুকরে বাধান পাতকূয়া। বিশুদ্ধ পানির একমাত্র অবলম্বন। প্রতিদিন এ সময়টি মেয়েদের পানি নেবার জন্য নির্ধারিত। এ সময়ে পুরুষরা এদিকে কেউ আসে না।

ঃ তোকে আজ সুন্দর দেখাচ্ছে মরিয়াম। নাদিয়া মন্তব্য করে। মরিয়াম তখন কূপে বালতি ফেলছিল।

ঃ লাগবে না। কিভাবে সেজেছে দেখছিস না! সবরিন ফোড়ন কাটে। ওদের মন্তব্য শুনে মরিয়াম হাসলো। হাসলে ওকে আরো সুন্দর দেখায়। টোল পড়ে দু'গালে।

ঃ তাইতো! চোখে দেখছি এই সকালেও আবার কাজল পরা হয়েছে।

ঃ হবেনা? দুপুর বেলা যে মুহসিন আসবে। -মুহসিন মরিয়ামের হবু বর। বিয়ের কথা পাকা পাকি প্রায়। তবে দিন-ক্ষণ ঠিক হয়নি। আজ দুপুরেই ঠিক হবে। ছেলে পক্ষ হতে লোক আসবে।

মরিয়াম এবারও কথা বললো না। আয়ত লোচনে তাকাল একবার। ঠোঁটে বাঁকা হাসি। কাজল ভরা চোখে এভাবে ওকে অপূর্ব লাগছে। নাদিয়া পানি ভরা বাদ দিয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল।

ঃ কি দেখছিস? মরিয়ামের প্রশ্ন।

ঃ তোকে।

ঃ আমাকে দেখার আবার কি হলো?

ঃ তুই খুব সুন্দর, জানিস?

ঃ জানি।

ঃ কত সুন্দর তা জানিস?

ঃ না।

ঃ তুই মারাত্মক ভীষণ সুন্দর।

মরিয়াম ও সবরিন শব্দ করে হেসে উঠলো। পাশের আরো কজন তাদের হাসিতে যোগ দিল। নাদিয়া তার বর্ণনা ভঙ্গিতে এরূপ শব্দ চয়নে লজ্জা পেল। লজ্জা দূর করার জন্য সেও ওদের হাসিতে যোগ দিল।

তারপর বালতি হতে পানি নিয়ে ওদের গায়ে ছিটাতে শুরু করলো। বাকিরাও বসে রইল না। শুরু হলো পানি ছিটাছিটির খেলা। আমের মঞ্জুরী ঝরার মত ওদের দেহ হতে হাসি ও আনন্দ ঝরে পড়ছে। নির্মল আনন্দে ভরে উঠলো গ্রামের শান্ত বাতাস। বাচ্চারা তাদের ছোটাছুটি বাদ দিয়ে যুবতীদের আনন্দ খেলা উপভোগ করতে লাগলো।

হঠাৎ হাসির রোল থেমে গেল। পানি ছিটাছিটি বন্ধ হলো। স্বর্গীয় পরিবেশ ভরে উঠলো বিষাদের কালো ছায়ায়। ভয় পাওয়া হরিণ পালের ন্যায় দিক বিদিক ছোটাছুটি শুরু করলো সকলে। "সৈন্য আসছে, সৈন্য আসছে" বলে এক কিশোর সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে নিজেও ঝড়ের গতিতে পালিয়ে গেল। নাদিয়া, মরিয়াম, সবরিন সহ সকল যুবতীর মুখ পাংশু হয়ে গেছে। পানির মশক ফেলে ওরা যে দিকে পারলো বেসামাল ছুট দিলো। হঠাৎ করে গ্রামের বাতাস ভারী হয়ে উঠলো। পাখীরা তাদের কলতান থামিয়ে দিল। কলমুখর গ্রামের রাস্তা নির্জনতায় মলিন হয়ে পড়ে রইল। কিন্তু তার মলিনতা বেশিক্ষণ স্থায়ী রইলো না। যন্ত্রদানবের নির্মম চাকার ঘর্ষণে আর অসভ্য বর্বর ইতালী সৈন্যদের বুটের আঘাতে তার মলিনতা বিষাদে ভরে উঠলো।

ছোটবড় অনেকগুলো মোটরযান লাইন ধরে দানবের মত এগিয়ে আসছে। সামনের খোলা জিপে মেশিনগান ফিট করা। একজন সৈন্য তা তাক করে ধরে আছে। তার পাশের জনের হাতে গুলির ফিতা সাজানো। পিছনের তিন চাকার মোটর সাইকেলে অফিসার বসা। লম্বা দোহারা গড়ন। চোখে বন্য হিংস্রতা। দুঠোঁটের মাঝে চুরুট। চুরুটের ধোঁয়ার আঁধারে কুটিল হাসি ঝিলিক দিচ্ছে। কেউ কিছু বুঝার আগেই অফিসারের নির্মম কণ্ঠ বেজে উঠলো–"ফায়া---র।

দু-একজন তখনো যারা পালাতে পারেনি– ঝড়ে পড়া কলাগাছের ন্যায় মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ারে তাদের পিঠ ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। গুলির শব্দ শুনে নৃত্যরত পাখিরা ভয়ে দিক-বিদিক ছুটে পালালো। অফিসারের ঠোঁটের কুটিল হাসি আরো বিকশিত হল।

আবার তার নির্মম কর্কশ কণ্ঠ বেজে উঠলো– "অপারেশন"। সাথে সাথে সৈন্যরা গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। শুরু হলো ঘরে ঘরে তল্লাশী। কিশোর, যুবক, মাঝবয়সী, মধ্য বয়সী ও প্রৌঢ়দেরকে ঘর থেকে জবাই করা পশুর ন্যায় পা ধরে টেনে বের করে আনা হল। ঘরে সংরক্ষিত আটা, ময়দা, গম ও পোশাক পরিচ্ছদ কূপের সন্নিকটে স্তূপ করা হল। কেরোসিন ঢেলে তাতে আগুন লাগান হল।একদিকে আগুনের লেলিহান, অন্য দিকে অত্যাচারিত আর্তমানবতার বাঁচার কাকুতি। সেই সাথে হিংস্র মানুষরূপী হায়েনাদের পৈচাশিক উল্লাস– সে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য।

পুরুষদের হাত-পা বেঁধে লাইন ধরে একটি দেয়ালের পাশে দাঁড় করানো হয়েছে। ত্রিশ চল্লিশ হাত দূরে রাখা হয়েছে মেশিনগান। প্রতিটি ঘরের সামনে শিশু ও মহিলারা নীরবে অশ্রু ফেলছে। শব্দ করে কাঁদার সাহস পাচ্ছে না। ভুলেও কেউ শব্দ করে কাঁদলে তার মাথায় রাইফেলের আঘাত পড়ছে।

শেখ ইয়াসিন খুবই অসুস্থ। বয়স আশি পেরিয়ে গেছে। তিনি গ্রামের মুরব্বী। অসুস্থ স্বামীকে সেবা করছেন স্ত্রী। পাশে বসা কিশোর ছেলে ইসমাইল। পাংশু মুখ। দুচোখের পাতায় ভয়ের প্রলেপ। হঠাৎ দরজায় বুটের আঘাত পড়ল। একবার-দুবার। ইসমাইল দরজা খুলবে কিনা ভাবছে। মায়ের পানে তাকালো একবার। দুচোখে ভয়ের ছাপ আরো প্রকট হয়েছে। মা কিছু বলার আগেই তৃতীয় আঘাত পড়ল। এবার দরজা ভেঙে গেল। দুজন নরপশু ক্ষিপ্র গতিতে শেখ ইয়াসিনের দুপা ধরে উঁচু করলো। স্ত্রী বাধা দিল। ওরা ততক্ষণে টানতে শুরু করেছে। স্ত্রী এবার মুখ খুললো।

ঃ উনি ভীষণ অসুস্থ। উনাকে ছেড়ে দাও।

ঃ উনাকে একেবারেই ছেড়ে দেওয়া হবে।– কথা বলেই তারা টানতে শুরু করলো।

ঃ আরজুক্ (অনুগ্রহ করুন)! সত্যিই উনি খুব অসুস্থ। আল্লাহ্ ইউখাল্লিক। (আল্লাহ তোমাদের মঙ্গল করবেন) উনাকে ছেড়ে দাও।–স্ত্রী এবার স্বামীকে জড়িয়ে ধরলো। ইসমাইল নির্মম মুখে এ দৃশ্য দেখছে। তার ভয় বিহ্বল পাংশু মুখে এখন প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে। অজান্তেই দুহাত মুঠিবদ্ধ হলো। সেও ছুটে গিয়ে প্রতিরোধে মায়ের সাথে যোগ দিলো। প্রতিদানে খেতে হলো বুটের আঘাত। পাঁচ হাত দূরে ছিটকে পড়ল ইসমাইল। তাঁর মাও ছিটকে পড়লো এক সাথে বুট ও রাইফেলের বাঁটের আঘাতে।

পা ধরে টেনে এনে শেখ ইয়াসিনকে রোদে চিৎ করে ফেলে রাখা হল।

অফিসার জুতায় মচ্‌মচ্ শব্দ তুলে অদূরে জড় করা মহিলাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। পদ মর্যাদায় মেজর তিনি। মুখে চুরুট। হাতে পিস্তল। বিশেষ কায়দায় পিস্তলটি হাতের মধ্যে বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে। শকুনের মত দৃষ্টি ফেলে সব মহিলার উপর একবার নজর বুলালেন। তার কুটিল হাসিতে এবার লালসার আভা ঝিলিক খেল। হঠাৎ ডান দিকে নজর গেল তার। মরিয়াম একপাশে তার মাকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। তাজা আঙ্গুরের ন্যায় অপরূপ চেহারা মুখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। মেজর তার সামনে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। কাপড়ে মুখ ঢাকলো মরিয়াম।

ঃ ও গড়! অপূর্ব। – মেজরের মুখ দিয়ে অজান্তেই বেরিয়ে গেল শব্দ দুটি।

তার নির্দেশে সমস্ত মহিলাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হল। যুবতী, মাঝ বয়সী ও প্রৌঢ়া। রাইফেল তাক করে তাদেরকে ঘিরে রাখলো এক দল সৈনিক।

মেজর আবার ফিরে এলেন লাইন দিয়ে দাঁড় করানো লোকগুলোর পাশে। ধীর পায়ে ঘুরে ঘুরে তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করলেন। স্বাস্থ্যবান এক যুবকের সামনে দাঁড়ালেন তিনি। মুখের কুটিলতা হঠাৎ হিংস্রতার রূপ নিল। তার জামার আস্তিন ধরে চিৎকার করে বলে উঠলেন—

ঃ বল উমর মুখতার কোথায়?

যুবক নীরব। চোখ দুটি বরফের মত শান্ত। কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পারছে সে।

ঃ বল উমর মুখতার কোথায়? পূর্বের থেকে কণ্ঠ এবার আরো হিংস্র।

ঃ জানি না! অস্পষ্ট কণ্ঠ যুবকের।

ঃ বল কোথায়?

ঃ জানি না। এবার স্পষ্ট।

ঃ মিথ্যা, মিথ্যা। তুই জানিস। শুনেছি মুসলমানেরা নাকি মিথ্যা বলে না।

ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ বলে না। ক্ষিণকায় বয়স্কা এক বৃদ্ধা চিৎকার ছুড়লো।

ঃ চু ----প! হারাম জাদা বুড্ডা! রক্তে বেশ তেজ দেখছি। শোন, তোমাদেরকে মাত্র দশ সেকেন্ড সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে ওমর মুখতার কোথায় না বল-----লে--------।

এ-ক, দু-ই-----গুনতে গুনতে হাটতে লাগলেন মেজর। নয় পর্যন্ত গুনে পূর্বের সেই যুবকের নিকট ফিরে এলেন। দ-শ! যুবকের মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লেন। তপ্ত বালুতে লুটিয়ে পড়লো যুবক। তাজা রক্তে ভেসে যাচ্ছে বালি।

ঃ বল্, বল্ তোরা ওমর মুখতার কোথায়?

ঃ কি অপরাধে ওকে গুলি করলে?— ষাট উর্ধ্ব এক বৃদ্ধ এগিয়ে এলো।

ঃ বাহ! বুড়ার শরীরে তো অনেক তেজ আছে দেখছি।

বল বুড্ডা, ওমর মুখতার কোথায়?

ঃ বিনা অপরাধে তুমি ওকে হত্যা করলে কেন?

ঃ কৈফিয়ত! হারামির বাচ্চা। বৃদ্ধের উত্তেজিত দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। দুটো গুলি তার মাথা ফুটো করে দিয়েছে।

চারদিকে নিস্তব্ধতা। সকলের মুখে ভয়ের ছাপ। অন্তরে বাঁচার আকুলতা। মেজরের মুখে ক্রূর হাসি। তৃপ্তিভরা পদক্ষেপে পিছিয়ে যাচ্ছেন তিনি। নির্দিষ্ট স্থানে এসে দাঁড়ালেন এক সময়। তারপর ইশারায় ফায়ারের নির্দেশ দিলেন। সাথে সাথে গর্জে উঠলো নিষ্ঠুর মেশিনগান। পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে সত্তুর আশিটি তাজা প্রাণ মাটিতে ঢলে পড়লো। মরুর তপ্ত বালুতে রক্তস্রোত বইতে লাগলো। ছোট বাচ্চা ও মহিলারা এবার শব্দ করে কেঁদে উঠলো। চোখের সামনে স্বামীর

মৃত্যু দেখলো, দেখলো পিতা, ভাই ও চাচার মৃত্যু। কি হবে তাদের এখন। কে দেখবে তাদের? তিন বছরের ছোট বাচ্চা লুতফি-নির্বাক চোখে চেয়ে আছে তার পিতার রক্তাক্ত দেহের দিকে। সে বুঝতে পারছে না– আর সকলের সাথে তার পিতাও অমন মাটিতে পড়ে গেল কেন?

কি হয়েছে তার পিতার? নড়াচড়া করছে না কেন?

ঃ আব্বু আব্বু–। তুমি অমন করছো কেন? কি হয়েছে? এত রক্ত কেন তোমার শরীরে।– কচি পায়ে ছুটে গেল লুতফি পিতার মরা দেহের কাছে। তার দু'চোখে অশ্রুর বন্যা বইছে।

মরিয়াম, নাদিয়া ও কয়েকজন মধ্য বয়সী মহিলাকে নিয়ে টানাটানি করছে সৈনিকরা। মরিয়াম চিৎকার দিচ্ছে ও নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। মাকে প্রাণ পণে জড়িয়ে ধরেছে মরিয়াম। কিন্তু দু'জন মানবরূপী বলিষ্ঠ সৈনিকের কাছে মানবতা হার মানালো। ওরা তাকে গাড়িতে উঠালো। মরিয়ামের মা নির্বাক চোখে সেদিকে চেয়ে রইল। তারপর দুচোখ উপরে তুলে বল্লো– " হে আল্লাহ! এখনো ভূমিকম্প হচ্ছে না কেন! এ অত্যাচার তুমি কিভাবে সইছো খোদা।"

শেখ ইয়াসিন অনেক কষ্টে এবার উঠে বসলেন। রোগাক্রান্ত দেহে হঠাৎ যৌবনের উদ্দিপ্ততা ফিরে এলো। তিনি চিৎকার দিয়ে কিছু বলার জন্য মুখ খুললেন। কিন্তু কোন শব্দ বের হবার পূর্বেই তার প্রাণ বায়ু বের হয়ে গেল। এক ঝাঁক তাজা বুলেট তার দেহকে ঝাঁঝরা করে দিলো। ইসমাইল অদূরে বসেছিল। চোখের সামনে পিতার মৃত্যু দেখলো। দেখলো গ্রামের আরো অনেক মানুষের মৃত্যু। ওর কিশোর মন হু হু করে কেঁদে উঠলো। এতিম হওয়ায় কষ্ট তার মনের মধ্যে অনুভূত হতে শুরু করল।

লাশগুলো ট্রাকে উঠান শেষ হয়েছে।

ওরা এখন ফিরে যাচ্ছে। চোখে মুখে বিজয়ের(?) পৈশাচিক হাসি। মেয়েদের আর্তচিৎকারে যন্ত্র দানবের শব্দ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। মরিয়াম হাত পা ছুঁড়ছে আর চিৎকার করছে–

ঃ মা, আমাকে বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও মা। ওরা আমার সব শেষ করে দিবে। আমাকে মেরে ফেলবে মা। মা------ মাগো -----। সকলের মুখেই এরূপ আর্তি। এই করুণ হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে প্রকৃতি কেঁদে উঠলো। কিন্তু সাদা চামড়ার পশুগুলোর হৃদয় বিগলিত হলো না। চোখে ওদের লালসার দৃষ্টি। অন্তর বিজয় গৌরবে (?) আন্দোলিত। কজন সৈন্য ঝটপট গাড়ি থেকে নেমে পড়লো হঠাৎ। রাস্তার দুধারে শস্য ক্ষেত। পাকা গমের গাছগুলো বাতাসে দোল খাচ্ছে। আর কদিন পরেই কাটা শুরু হতো।

কিন্তু তাদের সে দোল খাওয়া থেমে গেল। দেখতে দেখতে সমস্ত ক্ষেত জুড়ে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়লো।

মেজরের কুটিল হাসি এবার অট্টহাসিতে রূপ নিল।

## ॥ ৩ ॥

গ্রামের উপকণ্ঠে এসে উমর মুখতার ঘোড়ার গতিরোধ করলেন। কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে কেঁপে কেঁপে ধোঁয়া উঠছে কেন? তবে কি সৈন্যরা গ্রাম আক্রমণ করেছে? কোমরে ঝুলান বাইনোকুলার চোখে ধরলেন তিনি।

ঃ হায় আল্লাহ! একি দৃশ্য।

ঃ সায়্যেদ ওমর ! কি দেখছেন? বয়োবৃদ্ধ সাথী জানতে চাইল।

ঃ গমক্ষেত আগুনে জ্বলছে।

ঃ গ্রাম?

ঃ গ্রামেও আগুন জ্বলছে?

ঃ তবে কি ওরা গ্রাম আক্রমণ করেছে?

ঃ তাই মনে হচ্ছে। না জানি তারা কি ক্ষতি করেছে।

ঃ ওরা যে অমানুষ।

ঃ ইয়া আল্লাহ, হায়্যে বিনা। (এসো আমার সাথে) ঘোড়াকে ক্ষিপ্র গতিতে গ্রামের দিকে ছুটালেন ওমর মুখতার। পিছনে তার অনুচরেরা।

পিতার মৃত্যু সহ্য করতে পারছে না ইসমাইল। ঘরে ঢুকে দেওয়ালে টাঙানো ব্যাগ পাড়লো। মা ছেলের দিকে চেয়ে আছেন। কাঁদতে কাঁদতে তার চোখ শুকিয়ে গেছে। ইসমাইল ততক্ষণে জামা-কাপড় ভরতে শুরু করেছে।

ঃ কি করছো বাবা?

ঃ মা, ঘরে বসে এসব দেখা যায় না।

ঃ আমার যে আর কেউ রইল না বাবা?

ঃ কিন্তু তাই বলে ঘরে বসে থাকবো?

ঃ তুমি এখনো ছোট। যুদ্ধ করার মতো বয়স হয়নি।

ঃ তবুও মা– এ অন্যায় আর সহ্য করা যায় না। আমি এর প্রতিশোধ নিবো।

ঃ আমার কি হবে বাবা?

মায়ের গলা ধরে এলো। শুকনো চোখ আবার ভিজে উঠলো।

ঃ মা!

ঃ বাবা!

ঃ এতোগুলো মানুষকে চোখের সামনে মেরে ফেললো ওরা। ওরা আমার বড় ভাইকে ধরে নিয়ে গেছে। মা, তুমি এসব সহ্য করতে বল?

ঃ বাবা, আমি তোমায় বাধা দিবো না।

ঃ মা, তুমি দোয়া কর। আমি ওমর মুখতারের দলে যাচ্ছি।

আল্লাহ তোমাকে মঙ্গল করুন। ওমর মুখতারকে আরো শক্তিশালী করুন।

বেরিয়ে পড়ল ইসমাইল। কিন্তু বেশিদূর এগানো হলো না। ওমর মুখতার তাঁর দলবল নিয়ে ততক্ষণে গাঁয়ে প্রবেশ করেছেন।

বিস্তীর্ণ গমক্ষেতের প্রায় অর্ধেকটা পুড়ে গেছে। স্তূপাকৃত খাদ্যদ্রব্য পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ঘরে ঘরে চাপা কান্নার রোল তখনো থামেনি। এক এক করে বাচ্চা ও মহিলারা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ওমর মুখতারকে দেখে তারা আবার কান্নায় ভেঙে পড়লো। ইসমাঈল ধীর পায়ে ওমর মুখতারের কাছে গিয়ে বিনয়ের সাথে সালাম দিল।

ঃ ওয়ালাইকুমুস সালাম !

ঃ তোমরা নাম?

ঃ ইসমাঈল।

ঃ শেখ ইয়াসিন কেমন আছেন?

ঃ উনি আমার পিতা। উনাকে মেরে ফেলেছে।

ঃ কতক্ষণ হলো ওরা গ্রাম ছেড়েছে?

ঃ বেশি দূর যেতে পারেনি।

ঃ কোন দিকে গেছে?

ঃ দক্ষিণ দিকে।

ঃ ওরা কতজন ছিলো?

ঃ পঞ্চাশ ষাটজন। দশজন মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে।

ঃ আল্লাহু আকবার।

ওমর মুখতারের কণ্ঠ গুম গুম করে বেজে উঠলো। কে বলে এ সত্তর বছরের বৃদ্ধের কণ্ঠ।– তাঁর অনুচরেরা সাথে সাথে বলে উঠলো "আল্লাহু আকবার" তিনি আবার বললেন।

ঃ আল্লাহু আকবার।

এবার ক্রন্দনরত মহিলা শিশু সকলের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হল–

"আল্লাহু আকবার" আল্লাহু আকবার"। বেদনার ভারে নুয়ে পড়া গ্রামের সমীরণ হঠাৎ তার গতি ফিরে পেল। বিষাদের অশ্রুর পরিবর্তে সকলের চোখে এখন আনন্দের অশ্রু ঝরে পড়ছে। স্বজন হারার দুঃখ তারা ভুলে গেল মুহূর্তে। ওদের সামনে এখন দাঁড়িয়ে শত্রুর অন্তরে ত্রাস সৃষ্টিকারী কিংবদন্তীর মহাবীর ওমর মুখতার।

সদ্য বিধবা হওয়া শেখ ইয়াসিনের স্ত্রী ধীর পায়ে ইসমাইল এর পাশে এসে দাঁড়ালেন। তার শরীর কাঁপছে কচি পাতার মত। বেদনাক্লিষ্ট দুচোখের অশ্রু তখনো শুকায় নি।

ঃ সাইয়্যেদ ওমর! খুজ ইবনি মায়াক। হুয়া ছগীর। লাকিন কাবীর। (ইসমাঈলকে সাথে নাও। ও ছোট বটে তবে অনেক ব-ড়)। ওর বুকের আগুন নেভাতে সাহায্য করুন।

ওমর মুখতার ইসমাইলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকালেন শুধু। তার পর ঘোড়ার জীন চেপে ধরলেন। ইঙ্গিত পেয়ে ঘোড়া ছুটে চললো। পিছে তার অনুসারীগণ।

শত্রুরা বেশীদূর এগোতে পারেনি। মিনিট পাঁচেক পথ চলার পর মটরযান ওদের চোখে পড়লো। গতিতে ক্ষান্ত দিলেন ওমর মুখতার। গভীরভাবে ক সেকেন্ড ভাবলেন। তারপর সাথীদের বললেন।

ঃ আমাদের আক্রমণ হবে কমান্ডো টাইপের। ওই যে লম্বা উঁচু বালুর ঢিবি- আমরা ওর আড়ালে লুকিয়ে থাকবো। নিকটে এলে ক্ষ্যাপা সিংহের মত অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

ঃ ওরা যদি ও দিক দিয়ে না যায়?

ঃ যাবে। না গেলেও অসুবিধা নাই। সে চিন্তা পরে।

ঃ মায়াশি (ওকে) সাইয়্যেদ ওমর।

কিছু বুঝে উঠার আগেই ঝড়ে পড়া কলাগাছের মতো অনেক সৈন্য মাটিতে পড়ে গেল। দুটি গাড়ি উল্টে গেল। তারপর প্রচন্ড শব্দে বিস্ফোরণ হল। মুখের চুরুট টানা বন্ধ হলো অফিসারের। বিজয়ের (?) পৈশাচিক উল্লাসে যে মুখে আনন্দের ঢেউ খেলে যাচ্ছিল সেখানে ভয়ের বন্যা বইতে শুরু করলো। কোমরে হাত দিয়ে পিস্তল বের করে "ফায়ার" নির্দেশ দেবার পূর্বেই তার তিন চাকার মোটর সাইকেল উল্টে গেল। ড্রাইভারের কপালে এসে গুলি লেগেছে। মাথার খুলি উড়ে গেছে তার। দুটি গড়ান খেয়ে অফিসার উঠে বসলো। কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছে। পিস্তল তাক করে সামনে ধেয়ে আসা এক মুজাহিদকে গুলি করতে উদ্যত হল সে। কিন্তু তার আগেই ঘোড়ার জোড়া পায়ের আঘাত পড়লো তার পিঠে। সময় নষ্ট করা ঠিক নয় ভেবে মুজাহিদটি পর পর দুটি গুলি করলো ওর মাথায়।

সুযোগ পেয়ে বন্দী মহিলারা ড্রাইভারের রাইফেল কেড়ে নিল। তারপর আষাঢ়ের বৃষ্টির ন্যায় বিক্ষিপ্ত কিল ঘুষির আঘাতে তার একটি চোখ বেরিয়ে গেল। হঠাৎ নাদিয়ার চিৎকারে সকলে ক্ষান্ত হল-

ঃ ছেড়ে দাও ওকে, ছেড়ে দাও।

ঃ কেন নাদিয়া? ছবরিন জানতে চাইলো।

ঃ ওকে শাস্তি দিব আমি। ও আমার শরীর স্পর্শ করেছে। ওর উদ্ধত ওই হাত আমি আগে ভেঙে ফেলবো। তারপর যে চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, সেটি আমি আঙ্গুল দিয়ে উপড়ে ফেলব।

ঃ তার আর দরকার হবে না। একটি এমনিই বেরিয়ে গেছে–

ঃ কি করছো তোমরা---- এক মুজাহিদ তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সর, সময় নষ্ট করো না। ওর মাথা ও বুকে দুটি গুলি করলো মুজাহিদ।

পাঁচ মিনিটেই অপারেশন শেষ হয়ে গেল। পৈশাচিক উল্লাসে একটু আগে যারা নাচ্ছিল। তাদের নিথর দেহ বালুতে পড়ে রইল। একটু আগে নিরপরাধী মানুষগুলোকে যারা লাশ বানাল। তারাই এখন লাশ হয়ে পড়ে রইল। অল্প সময়ের মধ্যে কি এক পরিবর্তন! যে মেয়েগুলোকে নিয়ে তারা ফুর্তি করতে চেয়েছিল, সেই মেয়েগুলোই তাদের কাঁধ থেকে অস্ত্র খুলে নিয়ে ফুর্তি করছে।

শিশু, কিশোর মহিলা ও বেঁচে থাকা ক'জন বৃদ্ধ ও যুবক গ্রামের উপকণ্ঠে এসে দাঁড়িয়ে আছে। বুকে তাদের বেদনার সমুদ্র। চোখে আশার আলো। ওমর মুখতার নিশ্চয়ই তাদের শাস্তি দিবেন। শেখ ইয়াসিনের স্ত্রী দু হাত তুলে দুয়া করছেন–

"ইয়া আল্লাহ! উনসুরুল মাজাহিদীন।

উনসূর ওমর মুখতার– (আল্লাহ তুমি মুজাহিদগণকে সাহায্য কর। ওমর মুখতারকে সাহায্য কর) কচি শিশু, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই দুহাত তুলে বলছে। আমীন। আমী----ন।

তাদের প্রতীক্ষা শেষ হলো। ওমর মুখতার সকল বন্দীকে মুক্ত করে বীরদর্পে ফিরে আসছে। সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল–

আল্লাহু আকবার----- আল্লাহু আকবার।

## ॥ ৪ ॥

ওমর মুখতারের আন্দোলনের সময়ের কথা। বলতে গেলে লিবিয়াতে তখন গোত্রভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা চালু ছিল– যদিও ওসমানিয়রা সেদেশ শাসন করত। ১৮৬২ খ্রিঃ এই বীরের জন্ম হয় 'মুনস্কা' কবিলাতে। অল্প বয়সে তিনি পিতাকে হারান। হজ্জব্রত পালন করার পথে তিনি ইনতেকাল করেন। ওমর মুখতার তখন খুব নিচের ক্লাসের ছাত্র। পড়ালেখায় বরাবর ভাল। ওমর পিতার মৃত্যুর পর জাগবুব গিয়ে পড়ালেখা করতে থাকেন। সেখানে তিনি আট বছর অবস্থান করেন। তথাকার নেতৃবর্গ ও গণ্য-মান্য ব্যক্তি তাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন ও স্নেহ করতেন। কেননা, একদিকে তার কাজকর্ম ও কথাবার্তায় যেমন ছিল বুদ্ধিমত্তা ও

বিচক্ষণতা, তেমন তার চরিত্র মাধুর্য ছিল পবিত্র, সুন্দর ও মার্জিত। আর এ কারণে কবিলার নেতা সাইয়্যেদ মাহদী তাকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৮৯৭ সালে তিনি তাঁকে জাবালে আখদারের কুসুর এলাকার সরদার পদে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও যত্নসহকারে পথভোলা মানুষকে ধর্মের পথে দাওয়াত দিতে থাকেন। ১৯০২ সালে সাইয়্যেদ মাহদীর মৃত্যুর পর ওমর সকলের নিকট অত্যন্ত প্রিয় শিক্ষক ও নেতা হয়ে উঠেন। তিনি অসভ্য, অশিক্ষিত ও অবাধ্য এলাকার গোত্রসমূহকে সুশিক্ষা দান করতে বাধ্য করে তোলেন। আর এ জন্য ওসমানীয় সরকার তাকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানান। ঠিক এ সময় ১৯১১ সালে বানগাজিতে ইতালীরা অবতরণ করলে ওসমানীয় শাসকদের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়। ওমর মুখতারও সেই সংঘর্ষে যোগ দেন।

এ সময় বিশিষ্ট বীর, যোদ্ধা ও নেতা সাইয়্যেদ ইদ্রিস ও আহমদ শরীফ তার সাথে যোগ দেন। মিলিত শক্তি নিয়ে তারা একের পর যুদ্ধে ইতালীদেরকে নাস্তানাবুদ করে তোলেন।

মূলতঃ ওমর মুখতার একজন শিক্ষক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ধর্মজীবনও শুরু করেন শিক্ষক হিসাবে। কিন্তু ধীরে ধীরে কখন যে তিনি একজন বিচক্ষণ যোদ্ধা ও নেতা হয়ে ওঠেন, নিজেও তা বুঝতে পারেন নি। তার রণ-কৌশল, বীরত্ব ও বিচক্ষণতার কথা জানতে পেরে ইতালীর বড় বড় যুদ্ধবাজ জেনারেলরা পর্যন্ত বিস্মিত হয়েছে। তাদের মনে বদ্ধমূল ধারণা জমেছিল, নিশ্চয়ই সে কোন সুনিপুণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আর্মি অফিসার হতে রণকৌশল আয়ত্ত করেছে। কিন্তু যখন তারা জানতে পেরেছে যে, সে যেমন কোন সৈনিক নয়, তেমন কোন রণ প্রশিক্ষণ নেন নি কারো থেকে। সে একজন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকমাত্র। তখন তারা রাগে অপমানে টেবিল চাপড়ে হাতে ব্যথা পেয়েছেন।

মাঝারী প্রশস্তের ছোট একটি ঘর। কোন জৌলুস নেই ঘরে। কিঞ্চিত উঁচুতে ছোট খাটিয়ার উপর বসে পাঠ দান করছেন শিক্ষক ওমর মুখতার। সামনে বসা বিশ পঁচিশ জন ছাত্র। সকলের হাতে শ্লেট ও চক। তিনি নিবিষ্ট মনে পাঠ দান করে যাচ্ছেন। এক সময় তিনি পাঠদানে ক্ষান্ত দিয়ে বললেন–

ঃ বাশার!

ঃ হাদের ইয়া উসতাজ।

ঃ সূরা আর রহমান থেকে তেলাওয়াত করতো বৎস। বাশার উঠে দাঁড়াল। গায়ে লম্বা জাল্লাবিয়া। মাথায় টুপি। গোলগাল চেহারা। চোখ দুটো খুব সুন্দর, গলার স্বর অপূর্ব মিষ্টি। চোখ বুঝে বাশার দরদভরা কণ্ঠে তেলাওয়াত করে যাচ্ছে–

"দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নাম"

দয়াময় আল্লাহ!

তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন।

তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

মানুষকে ভাব প্রকাশ করতে তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন।

চন্দ্র-সূর্য আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে।

তৃণলতা ও বৃক্ষাদি তাঁরই বিধান মেনে চলে।

তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত, আর

স্থাপন করেছেন মানদণ্ড।

যাতে তোমরা ভারসাম্য লংঘন না কর।

ওজনে ন্যায্য মাপ প্রতিষ্ঠিত কর, আর ওজনে কম দিয়ো না।

------------ অতএব তোমরা উভয়ে তোমার প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

ঃ শুকরান ইয়া অলাদ! (ধন্যবাদ বৎস) বস! আচ্ছা তোমরা কি কেউ বলতে পারবে "বয়ান" অর্থ কি?

নাদের নামের একটি ছেলে উঠে দাঁড়াল।

ঃ পারবো উস্তাদ।

ঃ বল।

ঃ বয়ান হল বাকশক্তি।

অর্থাৎ আমাদের কথা বলার শক্তি।

ঃ সুন্দর বলেছ। বস। শোন– মানুষের উপর আল্লাহর এক অপার অনুগ্রহ এই কথা বলার শক্তি। তাই সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে, যেন কোন খারাপ কথা, মিথ্যা কথা মুখ দিয়ে বের না হয়।

আচ্ছা তোমরা কি বলতে পারবে সকল পাপের মূল কী?

নীরব সকল ছাত্র। পিছন দিকে বসা কয়েকটি ছাত্র একে অপরকে চিমটি কাটছে। লম্বা মত নিগ্রো ছেলেটি ভেগে যাওয়ার পথ খুঁজছে।

ঃ বিলাল।

ঃ জি ওস্তাজ।

ঃ তুমি বল।

ঃ পারবো না।

ঃ আচ্ছা বস। আর কেউ পারবে?

নিগ্রো ছেলেটি এবার উঠে দাঁড়াল।

ঃ পারবে তুমি?

ঃ না

ঃ তবে  দাঁড়ালে যে?

সকল ছেলে হেসে উঠলো। ছেলেটি যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি আবার বসে পড়লো।

ঃ শোন, সকল পাপের মূল হল মিথ্যা বলা। মিথ্যা একটি জঘন্য অপরাধ। যে মিথ্যা বলে সে ইচ্ছা অনিচ্ছায় অনেক পাপে জড়িয়ে যায়। ওমর মুখতার লক্ষ্য করলেন ছেলেদের মধ্যে কেমন চঞ্চলতা বিরাজ করছে। পাঠে তেমন মন নেই। বাইরে বাজনা ও আনন্দধ্বনির শব্দ হচ্ছে। ক্রমেই সে শব্দ কাছে আসছে।

ঃ আচ্ছা শোন! যে প্রশ্নটি লিখতে দিয়েছিলাম, সকলের তা লেখা হয়েছে?

ঃ জি ওস্‌তাজ– সকলের এক সাথে উত্তর।

ঃ তাহলে এগুলো জমা দিয়ে যাও।

প্রতিযোগিতার সাথে সকলে কাঠের  শ্লেটে লেখা প্রশ্নের উত্তর জমা দিল।

ঃ আজকের মত ছুটি তোমাদের।

হৈহৈ করে ছেলেরা কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

ওমর মুখতার একটি করে  শ্লেট দেখতে লাগলেন। এক  ছেলে লিখেছে "ওজনে ন্যায্য মাপ প্রতিষ্ঠা কর। জিনিসপাতি ওজনের সময় কম দিয়ো না। অন্য আর একজন লিখেছে "ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে অন্যায় দূর কর"– নিবিষ্ট মনে খাতা দেখা সম্ভব হলো না আর। আনন্দধ্বনি ও বাজনার শব্দ খুব নিকটে এসে গেছে। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। পাগড়িটি কাঁধে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালেন। দেখলেন স্কুল চত্বরে ছেলে, বুড়ো, মহিলা অনেক লোক। সকলের শরীর হতে আনন্দ ঝরে পড়ছে অজস্র ধারায়। দফের শব্দের তালে তালে অনেকে বিশেষ কায়দায় নাচছে। মহিলারা উলুধ্বনি দিচ্ছে। ওমর মুখতার এগিয়ে গেলেন। তাঁর মুখেও হাসি ফুটে উঠলো। তিনদিন আগে পাঠানো মুজাহিদ বাহিনী বিজয় অর্জন করে ফিরে এসেছে। তাদের অভ্যর্থনার জন্য গ্রামবাসীর এই আয়োজন।

১৯১১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর। ত্রিপলীবাসীরা ভয়ে অস্থির। ইটালির রণতরী রাজধানীর কিনারে এসে ভিড়েছে। রণতরীর নেতৃবৃন্দ ত্রিপলীর শাসকদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিলো। সে নির্দেশ তারা প্রত্যাখ্যান করলে ৩রা অক্টোবর মঙ্গলবার রণতরী হতে ক্ষেপণাস্ত্রের আক্রমণ শুরু হলো। অল্পক্ষণে ত্রিপলীর পুরান দুর্গ প্রতিরোধের অযোগ্য হয়ে পড়ল। ত্রিপলী ইতালীদের হস্তগত হল।

ইতালীরা এরপর তাদের রণতরী নিয়ে সমুদ্র বন্দর বানগাজীর দিকে অগ্রসর হল। ৪ অক্টোবর বুধবার তারা বানগাজীর উপর আক্রমণ শুরু করলো 'সাবরি'

নামক স্থান দিয়ে তাদের কামানগুলো বানগাজিতে আঘাত হানতে শুরু করলো। ওসমানীয় শাসকগোষ্ঠীর সৈন্যদের সাথে তাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলো। কিন্তু ইতালীদের আক্রমণের সামনে তারা টিকতে পারলো না। সৈন্য অপসারণ করে তারা ভেগে গেল। রণতরী হতে ইতালী সৈন্যরা বানগাজির ভূমিতে পা রাখলো। অল্প কদিনের মধ্যে তারা লিবিয়ার উপকূলীয় অঞ্চল দখল করে নিলো। কোন বাধা বা প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হলো না তাদের।

ওসমানীয় সৈন্যরাও রণতরী ততদিনে পিছু হটাতে শুরু করেছে।

অল্প কদিনেই ইতালীরা তাদের অবস্থান পাকাপোক্ত করে নিলো। তারপর শুরু হলো তাদের তাণ্ডবলীলা। সমুদ্র উপকূলের সন্নিকটের একটি গ্রামে তারা হঠাৎ একদিন হানা দিল। বেলা তখন দ্বিপ্রহর প্রায়। গ্রামের মানুষ কাজে ব্যস্ত। মেয়েরা রান্নার আয়োজন করছে। বাচ্চারা দৌড়াদৌড়ি ও খেলাধুলা করছে। অনেকে গ্রামের পাশের চারণ ক্ষেতে উট ও ছাগল চরাচ্ছে। হঠাৎ মোটরযানের শব্দে তারা কাজ ফেলে চেয়ে রইল। দু'একজন ছাড়া গ্রামের অধিকাংশ মানুষ মোটরযান দেখেনি। তারা দেখলো খাকি পোশাক পরা অনেক মানুষ মোটরযানে, তাদের হাতে অস্ত্র। এরা কারা! ওসমানীয় সৈন্যদের পোশাক তো এমন নয়! তাদের চেহারাও এমন নয়। তবে এরা কারা! কি জন্য এসেছে?

কিছু শিশু কিশোর মজা দেখার জন্য এদের পিছু নিল। উঁচু নিচু রাস্তা বেয়ে মোটরযানগুলো গ্রামে প্রবেশ করলো। কমান্ডারের নির্দেশ পেয়ে সৈন্যগুলো ঝটপট গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। তারপর শুরু হলো তাদের তাণ্ডবলীলা।

প্রতি ঘরে ঘরে তল্লাসী চালিয়ে তারা শিশু ও বৃদ্ধদেরকে এক জায়গায় জড় করলো। চার বছরের ছেলে হামাদা। ওর মায়ের খুব প্রিয়। হামাদার চেহারা পুতুলের থেকেও সুন্দর। মনে হয় অভিজ্ঞ শিল্পী তার সকল শৈল্পিক নৈপুণ্য দিয়ে তাকে সৃষ্টি করেছেন। তার নিষ্পাপ সুন্দর চেহারার দিকে একবার দৃষ্টি পড়লে তা ফেরান বড় কঠিন।

এরূপ দৃশ্য দেখে হামদা তার মাকে ঝাপটে ধরেছিল। মা ছেলেকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে ভয় দূর করার চেষ্টা করছিল। তিন সন্তানের মৃত্যুর পর তাদের এই সন্তান। হামাদার মায়ের নাম ওরদা (গোলাপ)! গোলাপের মতোই সুন্দর ওরদা। এক চোখ অন্ধ শাশুড়ী সমূহ বিপদ টের পেয়ে বললোঃ

ঃ বৌমা ! তুমি হামাদাকে নিয়ে পিছন দিকের বড়ো ঘরটায় আশ্রয় নাও।

ঃ কিন্তু আপনি মা!

ঃ আমার কথা চিন্তা করো না। আমি বৃদ্ধা মানুষ।

ঃ তুবও মা! আপনার যদি কিছু করে ওরা।

ঃ আমাকে কিছু বলবে না ওরা। তুমি তাড়াতাড়ি পালাও মা।

ওরদার আর পালানো হলো না। দুজন ইতালী হায়েনা ওদের ঘরে প্রবেশ করলো। ভয়ে হামাদা তার মায়ের বুক আরো জোরে ঝাপটে ধরলো। ওরদা নিজের চেহারাকে আবৃত করে রাখলো। হায়েনা দুটি পরস্পর নীরবে দৃষ্টি বিনিময় করল। তারপর একজন এক টানে হামাদাকে তার মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিল। ছেলেকে শামলাতে গিয়ে ওরদার গোলাপের মত সুন্দর ও পরিপুষ্ট যৌবন বিকশিত হল।

হায়েনা দুটি আরো হিংস্র হয়ে উঠলো। বৃদ্ধা শাশুড়ী ও হামাদাকে দড়ি দিয়ে বাঁধলো তারা। মায়ের কাছে যাবার জন্য হামাদার সে কি আকুতি। তার নরম কপোলে সজোরে দুটি চপেটাঘাত দিল এক সৈনিক। সাদা চেহারায় পাঁচ আঙ্গুলের দাগ ফুটে উঠলো। হামাদা সম্বিত হারাল। কিছুক্ষণ পর যখন তার জ্ঞান ফিরলো তখন সে এক কুৎসিত দৃশ্য দেখলো। মায়ের বিবস্ত্ররূপ ও হায়েনাদের আচরণ তার কচি মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। ব্যাপারটি না বুঝলেও জঘন্য খারাপ কিছু তা সে বুঝতে পারলো। দাদীর দিকে তাকিয়ে দেখলো তিনি দুচোখ উপর দিকে উঠিয়ে বিড় বিড় করে আল্লাহর কাছে কি যেন বলছেন। হামাদার কচি মুখ থেকে অজান্তে এক গালি বেরিয়ে এলো। এক সৈনিক উঠে তার মাথা লক্ষ্য করে পর পর দুটি গুলি করলো। মাথার ঘিলু একদিকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। রক্তে হামাদার দেহও মাটি ভিজে যাচ্ছে।

বাধা শরীর বিশ-পঁচিশ সেকেন্ড পর নিথর হয়ে পড়ে রইল। ওরদা কিছুই করতে পারলো না। দুই পৈশাচিক শক্তির কাছে সে নিরুপায়। ছেলের মৃত্যুর এই বীভৎস দৃশ্য দেখে সে জ্ঞান হারাল। দাদি চিৎকার দিয়ে কাঁদছে আর বলছে।

ঃ হামাদারে একি হলো তোর! খোদা এদের এই অত্যাচারে তোমার আরশ কি কেঁপে উঠছে না! তোমার গজব কখন আসবে খোদা!!

প্রায় পঞ্চাশ জন শিশু ও বৃদ্ধাকে এক লাইনে দাঁড় করানো হয়েছে। বিশ হাত দূরে মেশিনগান তাক করে একজন সৈনিক বসে আছে।

অফিসারের নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে মেশিনগান গর্জে উঠলো। তাজা নিষ্পাপ দেহগুলো মাটিতে পড়ে গেল, অদূরে বসে প্রতিটি মা তার সন্তানের মৃত্যু দেখলো। তাদের বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে এলো। কিন্তু কেউ কাঁদতে পারলো না। যে কাঁদলো তার দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। এই অমানুষিক দৃশ্য দেখে গ্রামের বাতাস ভারী হলেও ইতালীর হায়েনাদের মনে দাগ কাটলো না। তাদের পৈশাচিক উল্লাসে প্রকৃতি লজ্জা পেল। গৃহপালিত পশু অশ্রু বিসর্জন দিলো। বাতাস তার গতি হারিয়ে ফেললো।

বিজয় (?) উল্লাসে সৈন্যরা ফিরে গেল। কোন অপরাধে এতগুলো নিষ্পাপ প্রাণ শেষ হলো ও অসংখ্য নারীর ইজ্জত নষ্ট হলো গ্রামবাসীরা তা বুঝতে পারলো না। বিমূঢ়বিস্ময় ও ভয়ের মধ্যে তারা অস্থির হয়ে রইল।

ইতালী সৈন্যদের অত্যাচারের কথা মুখে মুখে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো। বিশেষ করে ত্রিপলী ও বারকার অত্যাচারের কথা। লিবিয়ার গোত্রপ্রধানগণ একত্রিত হয়ে ইতালীয়দের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। বারকাতে ওসমানীয়দের সহযোগিতার জন্য প্রথমে যিনি এগিয়ে এলেন তিনি হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ওমর মুখতার। তিনি 'কুফর' এর নেতা সায়্যেদ আহমেদ শরীফের সাথে দেখা করলেন এবং ইতালীদের ত্রিপলী ও বানগাজী দখল ও তাদের অমানুষিক অত্যাচারের কথা অবগত করালেন। এরপর তিনি তাঁর তত্ত্বাবধানের সকল গোত্রসহ আশেপাশের সকল গোত্রের সাথে সমন্বয় সাধন করে ইতালীদের বিরুদ্ধে জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

## ॥ ৫ ॥

মূলত তখন ওসমানীয়রা লিবিয়া শাসন করতো। ইতালীদের লিবিয়ায় প্রবেশের পর ওসমানীয়রা তাদের সাথে সন্ধিতে আবদ্ধ হয়। এই সন্ধির ভিত্তিতে ইতালীয়রা উপকূলীয় এলাকা জুড়ে তাদের কর্মতৎপরতা বজায় রাখবে বলে মীমাংসা হয়।

অন্য দিকে ১৮ অক্টোবর ১৯১২ সালে ইতালী এবং তাদের মধ্যে আর এক সন্ধি হয়। এই সন্ধির ভিত্তিতে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ হয় এবং ওসমানিয়রা লিবিয়া থেকে তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করে। সেই সাথে তারা ত্রিপলির ও বারকা-এর অধিবাসীদের নিকট এই মর্মে লিফলেট বিলি করে যে, তারা যেন ইতালীয়দের অনুগত হয়ে চলে, ওসমানীয়রা তাদেরকে কোন প্রকার সাহায্য করতে পারবে না।

এর পরের ঘটনা খুবই হৃদয়বিদারক। ইতালীয়রা পশ্চিম ত্রিপলী ও বারকা-র অধিবাসীদের চরমপত্র প্রদান করে। তাতে তারা উল্লেখ করে।

"আইন ধারা ৩৮ মোতাবেক যা ২৫ নভেম্বর ১৯১২ সালে জারি করা হয়েছে, আজ থেকে ত্রিপলী ও বারকা ইতালীদের অধীন এলাকা বলে বিবেচিত হল। যারা যুদ্ধে লিপ্ত তারা ফিরে এলে সাধারণ ক্ষমায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।"

ওসমানিয়রা শামছুদ্দিন বাশাকে প্রতিনিধি হিসাবে লিবিয়দের নিকট পাঠাল। তিনি লিবিয়দেরকে ইতালীয়দের আনুগত্য স্বীকার করার পরামর্শ দেন এবং তাদের সাথে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত না হওয়ারও পরামর্শ দেন। এতে করে লিবিয়রা দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল ইতালীদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে মত দেয়। অন্যদল তাদের সাথে আলোচনায় বসতে রাজি হয়।

তুর্কীদের এই পশ্চাদপদতার ফলে মুজাহীদ নেতৃবৃন্দ কনফারেন্সে বসলেন। সর্বসম্মতিক্রমে তারা পশ্চিম ত্রিপলী নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করলেন। এর প্রধান হলেন শেখ সুলাইমান আল বারুনী।

এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ওসমানীয়রা লিবিয়দের সহযোগিতায় এগিয়ে এলে পশ্চিমা মিত্রশক্তির রণক্ষেত্রে পরিণত হয় লিবিয়ার ভূমি।

অন্যদিকে তুর্কী শাসক আনোয়ার পাশা লিবিয়া ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। লিবিয়া ত্যাগ করার পূর্বে তিনি মুজাহীদ নেতা আহমদ শরীফের সাথে দেখা করে ওসমানী খলিফার অভিপ্রায় জানিয়ে দেন যে, এখন থেকে লিবিয়রা নিজেরাই নিজেদের প্রতিরোধ করবে এবং তারা স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করতে পারবে।

ওসমানিয়দের শেষ প্রতিনিধি আজিজ বেগ মাসরী লিবিয়া ত্যাগ করার সময় সমস্ত অস্ত্র নিয়ে ফিরে যেতে চাইলে লিবিয়রা তাকে নিষেধ করে। কিন্তু তিনি সে নিষেধ প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ ইতোপূর্বে ইতালীয়দের সাথে তাদের গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু আহমদ শরীফ এই বিশাল অস্ত্রভাণ্ডার হাতছাড়া করতে মোটেও রাজি ছিলেন না। তাই ওমর মুখতারকে ডেকে তিনি আজিজ বেগের সমস্ত অস্ত্র জোর করে কেড়ে নেবার আদেশ দিলেন।

ওমর মুখতার একদল বিশ্বস্ত সাহসী মুজাহীদ বাহিনী নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করলেন। কিন্তু ওমর মুখতার নির্দিষ্ট স্থানে পৌছানোর পূর্বেই স্থানীয় মুজাহিদগণ আজিজ বেগের উপর গোলাবর্ষণ শুরু করে। দু'দলে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। কিন্তু আজিজ বেগ সমস্ত অস্ত্র নিয়ে সুল্লুমের পথ ধরে এস্কান্দারিয়া হয়ে আস্তানাতে পৌছে যায়।

আজিজ বেগের লিবিয়া ত্যাগের পর সত্যিকার অর্থে লিবিয়া প্রতিরোধশূন্য হয়ে পড়ে। ইতালীয়রা সমস্ত লিবিয়া অনায়াসে ও বিনা বাধায় পদানত করার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু মরুসিংহ ওমর মুখতার তাদের সে স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দেন। কারণ আজিজ বেগের লিবিয়া ছাড়ার পর মুজাহীদদের পুরা নেতৃত্ব অনেকটা তাঁর উপরেই ন্যস্ত হয়। তিনি মুজাহীদদের গোত্রে গোত্রে বিভক্ত করে শক্তি বৃদ্ধি করেন।

অন্যদিকে ইতালীয়রাও তাদের সৈন্যকে বিভিন্ন ইউনিটে বিভক্ত করে মুজাহীদদের উপর আক্রমণ শুরু করে। এভাবে চলতে থাকে বেশ কিছু দিন। এর মধ্যে এসে যায় ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। উভয়ে সম্মিলিত শক্তি নিয়ে এই প্রথম পরস্পর পরস্পরের মুখামুখি হয়। কিন্তু এর মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে অবস্থান পরিবর্তন ঘটে।

বারকা, সানুসুনি সহ সকল এলাকার অধিবাসীরা অচিরেই ইতালীদের কবল থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারবে বলে আশা পোষণ করতে শুরু করে।

## ॥ ৬ ॥

কখনো অতর্কিত কখনো সম্মুখ সমরে আক্রমণ চালিয়ে ইতালীয়দেরকে অতিষ্ঠ করে তুলনেল ওমর মুখতার। ইতালীয়রা হন্যে হয়ে তাকে খুঁজতে লাগলো। কোন দিশা না পেয়ে তারা অত্যাচার শুরু করলো সাধারণ জনগণের উপর।

এ অবস্থায় একদিন সন্ধ্যার পূর্বে সকল মুজাহীদকে একত্রে জমা হবার নির্দেশ দিলেন ওমর মুখতার। জামাতের সাথে মাগরিবের নামাজ আদায় করলেন সকলে।

তিনি জায়নামাজে বসেই পিছন দিকে ফিরলেন।

ঃ বিশেষ একটি কাজে আপনাদের জরুরী তলব করা হয়েছে। আমাদের গোলা বারুদের অবস্থা খুবই নাজুক। উন্নত ধরনের কোন হাতিয়ার নাই। আজিজ বেগ মাসরীর কাছ থেকে অস্ত্রগুলোও আমরা ছিনিয়ে নিতে পারি নাই। অন্য দিকে মিসর থেকে আমি যে অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছি তাও যথেষ্ট নয়।

ঃ সায়্যেদ ইদ্রিসের দৃষ্টিভঙ্গি কি? একজন মুজাহীদ নেতা জানতে চাইলেন।

ঃ তিনি আপাতত মিসরেই অবস্থান করবেন। তাঁর প্রধান কাজ হচ্ছে অর্থ সংগ্রহ, সমর্থন ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। পুরা দায়িত্ব তিনি আমার উপর অর্পণ করেছেন।

ঃ যতদূর মনে হচ্ছে ইতালীরা মিসরের সাথে আমাদের যোগাযোগ বন্ধ করার চেষ্টা করবে।

ঃ ইতোমধ্যে তা তারা করতে শুরু করেছে। সাল্লুমের পথ ধরে আসার সময় তারা তিনটি গাড়ির বহর নিয়ে আমার উপর আক্রমণ চালিয়েছিল।

ঃ তারা কি মিসর সীমান্ত বন্ধ করে দিবে? অন্য মুজাহীদের প্রশ্ন।

ঃ অতি সত্বর সেটি তারা করবে।

ঃ কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে?

ঃ হ্যাঁ ! তার পরও কথা থাকে।

ঃ কী?

ঃ মিসর সরকারের সাথে খুব তাড়াতাড়ি তারা এক চুক্তি সম্পাদন করতে যাচ্ছে।

ঃ কোন বিষয়ে?

ঃ আমাদের সহযোগিতা না করার এবং সীমান্ত বন্ধ করে দেয়ার জন্য।

ঃ তা হলেতো সমস্যায় পড়তে হবে!

ঃ আমাদের জীবনটাইতো সমস্যা ও অনিশ্চয়তাপূর্ণ।

ঃ আমাদের এখন করণীয় কী? – বয়স্ক এক মুজাহীদ জানতে চাইলেন।।

ঃ ওদের অস্ত্রাগার লুট করা।

ঃ খুব-ই কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ।

ঃ মুজাহীদদের জীবনে কঠিন বলে কিছু নাই। আর ঝুঁকি তো থাকবেই।

ঃ কবে সেটি করতে চান?

ঃ আজই!

ঃ আমরা প্রস্তুত।

ঃ আমিও আপনার সাথী হতে চাই।– ইসমাইল উঠে দাঁড়াল। তার কণ্ঠে দীপ্ততার ছাপ।

ঃ তুমি নেহায়েত ছোট ইসমাইল। অন্য কোন অপারেশনে তুমি শরীক হয়ো।

ঃ তাহলে তো আমাদের এখনই রওয়ানা হতে হবে।

ঃ হ্যা, প্রস্তুত হয়ে নিন। এশার সালাত আদায় করে আমরা রওনা শুরু করবো।

শুক্লার চাঁদ দিগন্তজোড়া মরুর কিনারে হেলে পড়েছে। একটু পরেই অস্তমিত হবে। তার স্বস্প মলিন কিরণ মরুর বুকে এক মায়াবী মূর্চ্ছনা সৃষ্টি করেছে। সেই মূর্চ্ছনায় অবগাহন করতে করতে একদল মুজাহীদ এগিয়ে চলেছে। বুকে তাদের অসীম সাহস। মৃত্যু তাদের কাছে পদানত। কোন বাধা ওদের গতিরোধ করতে পারেনা। কোন পিছুটানও তাদেরকে মায়ার বাঁধনে জড়াতে পারে না।

বাঁকা চাঁদ মরুর অপর প্রান্তে হারিয়ে গেল এক সময়। হাল্কা আঁধার জড়িয়ে ধরলো মুজাহীদদের। আকাশের তারারা ওদের পানে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে। চাপা মিষ্টি কণ্ঠে এক মুজাহীদ কুরআনের আয়াত পাঠ করছে–

"আর মুহাম্মদ স. তো একজন রাসূলমাত্র।

নিঃসেন্দেহে তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল গত হয়েছেন। তাঁর যদি মৃত্যু হয় অথবা যদি শহীদ হন, তবে কী তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? এতে যে পশ্চাদপসরণ করবে, সে আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। বরং আল্লাহ কৃতজ্ঞগণকে অচিরেই পুরস্কার দান করবেন।"

ওমর মুখতার এগিয়ে যাচ্ছেন দলের সাথে। মাথায় নানান চিন্তা। ইতালীরা দিন দিন বন্য ও হিংস্র হয়ে উঠছে। তাকে বন্দী অথবা বশ করার জন্য তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। চারিদিক থেকে তারা সাহায্য সহযোগিতার পথ বন্ধ করে দিচ্ছে। আমাদের জনবল যেমন কম, তার থেকে কম অস্ত্র বল। পুরানো টু-টু নাট রাইফেল ছাড়া ভারি কোন অস্ত্র নাই। ঘোড়া ছাড়া কোন যানবাহন নাই। অবশ্য যান থেকে ঘোড়াই নিরাপদ। ওদের রয়েছে ট্যাঙ্ক, হেভী মেশিনগান,

মর্টার, সর্বোপরি রয়েছে দুর্ধর্ষ বিমান বাহিনী। ওদের প্রতিরোধ ও মোকাবেলা করা খুবই দুরূহ ও কঠিন কাজ। কিন্তু তবুও তো নতি স্বীকার করা যায় না। অন্যায়ের কাছে মাথানত করার থেকে মৃত্যুই শ্রেয়। পরাধীনতার সাথে কুকুরের মতো বেঁচে থাকার চেয়ে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ অনেক ভালো।------------ তাদের প্রতিরোধ ও মোকাবেলার জন্য পথ একটা আমাদের বের করতেই হবে। নিজস্ব প্রযুক্তিতে আমাদের কিছু অস্ত্র উদ্ভাবন করতে হবে। যার মাধ্যমে আমরা তাদের ট্যাংক বিধ্বস্ত করতে পারবো ও তাদের যান উড়িয়ে দিতে পারবো। কিন্তু সে সব তৈরি করতে গেলে প্রয়োজন কাঁচা মাল ও প্রচুর অর্থের।

ঃ সাইয়্যেদ ওমর! চিন্তায় ছেদ পড়লো ওমর মুখতারের।

ঃ হাদের।

ঃ আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি। এখন এভাবে চলা নিরাপদ নয়। বয়োবৃদ্ধ এক মুজাহীদের মন্তব্য।

ঃ ঠিক বলেছেন। শত্রুরা ওৎ পেতে থাকতে পারে।

ঃ সাইয়্যেদ! আমরা চারটি দলে বিভক্ত হতে পারি। একদল সামনে । তার পিছনে অন্য দল। এবং তাদের সমান্তরালভাবে অন্য দুটি দল!

ঃ আপনি ঠিক বলেছেন। তবে আর একটি দল গঠন করতে হবে।

ঃ কোন দল?

ঃ সেটি হবে খুবই ক্ষুদ্র অথচ ক্ষিপ্র দল। তাদের কাজ হলো অস্ত্রাগারের প্রধান ফটক ভেঙে ফেলা এবং ভিতরে গিয়ে তা খুলে দেয়ার ব্যবস্থা করা।

ঃ ঠিক বলেছেন।

ঃ এজন্য দরকার কজন শক্তিশালী সাহসী যুবকের। বলার সাথে সাথে বিশ পঁচিশজন যুবক সামনে এসে দাঁড়ালো।

ঃ আমি মাত্র দশ জনকে চাই। বাকিরা থাকবে প্রথম দলে। ওদেরকে সাপোর্ট করাই হবে তাদের প্রধান কাজ।

পাঁচ দলের পাঁচজনকে নেতা বানিয়ে দেওয়া হল। তৃতীয় দলকে দায়িত্ব দেয়া হল প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও গোলা বারুদ সংগ্রহ করার জন্য। চতুর্থ দলের দায়িত্ব হলো বহন অযোগ্য ভারী অস্ত্র ধ্বংস করা।

খুব সন্তর্পণে পাঁচটি দল নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াগুলোও বুঝতে পারছে পরিস্থিতি। তারাও কোন শব্দ করছে না।

অদূরেই ইতালীয়দের অস্ত্রাগার। উঁচু প্রাচীরের বেষ্টনি দেয়া চতুর্দিক। বেষ্টনির উপরে তারকাটার ছাওনি। কোন মানুষের পক্ষে তা অতিক্রম করা বেশ

কঠিন। মোটা লোহার পাত দিয়ে তৈরি প্রধান ফটক। পনের ফুটেরও অধিক উঁচু। ভারী অস্ত্র হাতে কজন ইতালী সৈন্য অলসভাবে পায়চারি করছে। সম্মুখের দশজন মুজাহীদ ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে ওদের উপর গুলি ছুঁড়লো। কিছু বুঝে উঠার আগেই তাদের দেহ কাটা কলাগাছের ন্যায় মাটিতে পড়ে গেল। ঝট্পট দুজন মুজাহীদ তাদের পকেট হাতড়িয়ে চাবী খুঁজতে শুরু করলো। অন্য কজন কপাটে ঠেলা দিতে শুরু করলো। কিন্তু কিঞ্চিত পরিমাণ নড়াতে পারলো না। অগত্যা ঝটপট কজন ফটক বেয়ে উপরে উঠে গেল। অপর প্রান্ত থেকেই খুলতে হবে। পিছনের দলগুলো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। ফটক না খোলা পর্যন্ত তারা এগোতে পারছে না। এগোনো উচিৎও নয়। সেরূপ নির্দেশ নাই।

হঠাৎ ফটক খুলে গেল। প্রবেশের সংকেত বেজে উঠলো মুজাহীদ নেতার কণ্ঠে। বন্যার স্রোতের ন্যায় মুজাহীদরা অভ্যন্তরে প্রবেশ শুরু করলো। প্রবল স্রোতের তোড়ে খড়কুটো যেমন ভেসে যায় মুজাহীদদের ক্ষিপ্রতার সামনে তেমন ইতালী সৈন্যদের বাধা বিলীন হয়ে গেল। তারা কিছু বুঝে উঠার আগেই মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। অনেকে ঘুম থেকে উঠে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাইরে এসে আর ভেতরে ঢুকার অবকাশ পেল না। তাজা দেহ নিস্তেজ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও গোলা নিয়ে মুজাহিদরা তাদের ঘোড়া ও উটের পিঠ বোঝাই করলো। তারপর শুরু হলো অগ্নিসংযোগ। রাতের আঁধার বিদীর্ণ করে প্রচণ্ড শব্দে আগুনের গোলা উপরে উঠতে লাগলো। নিঝুম নিস্তব্ধ মরুর রাত বিস্ফোরণের আনন্দে মেতে উঠলো।

মুজাহিদরা তাকবীর দিতে দিতে নিজেদের আস্তানায় ফিরে চললো।

## ॥ ৭ ॥

আক্রমণের পর আক্রমণ করে ইতালীয়দেরকে অতিষ্ঠ করে তুললেন ওমর মুখতার। সব জায়গায় তারা চরমভাবে মার খেতে শুরু করলো। হারাতে থাকলো অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সৈন্য। সাথে মোটর যান ও গোলা বারুদ। মার্শাল বাদিলিউ ইতালীতে সব লিখে জানালেন। তিনি আরো সৈন্য, অত্যাধুনিক অস্ত্র, ট্যাংক ও বিমান বাহিনীর সাহায্য চেয়ে আবেদন করলেন। অতি সত্বর সাহায্য এসে বানগাজি পৌছল। ওমর মুখতারকে শায়েস্তা করার জন্য ইতালীয়রা এবার আরো মরিয়া হয়ে উঠলো। তারা নতুন পরিকল্পনা করলো। আর্মি অফিসারদের নিয়ে মার্শাল বাদিলিউ এক জরুরী মিটিং-এ বসলেন। মিটিং-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা গাদামেস ও জাবালে আখদার আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আর এই আক্রমণের দায়িত্ব পড়লো যুদ্ধবাজ সাহসী অফিসার জারাজায়ানীর উপর।

১৯২৮ সালের জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহ। জারাজায়ানী তার সৈন্যকে দুটি ভাগে ভাগ করলেন। একটি পাঠালেন গাদামেসের দিকে। অন্যটি জাবালে আখদারের দিকে। ওমর মুখতার তখন অবস্থান করছিলেন জাবালে আখদারে। তিনি ইতালীদের এই অগ্রাভিযানের কথা তাঁর চরের মাধ্যমে জানতে পারলেন। মনে মনে তিনি ইতালীদের চরম শাস্তি দেবার মনস্থ করলেন। পুরা মুজাহীদ বাহিনীকে তিনি উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশ করে নিজেই যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন।

ইতালীরা মুজাহীদদের সীমানায় ঢুকে পড়ার সাথে সাথে তাদের রাইফেল গর্জে উঠলো। শুরু হলে রক্ষক্ষয়ী যুদ্ধ। পাহাড়ের উপর থেকে নিজেদের তৈরি পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে মুজাহীদরা ওদের মোটরযান ও ট্যাংকে আগুন লাগিয়ে দিল। চরম ক্ষতির সম্মুখীন হলেও ইতালী বাহিনী পিছপাও হলো না। যুদ্ধ চলতে থাকলো অবিরাম। এক এক করে চার দিন অতিবাহিত হল। ওমর মুখতার প্রমাদ গুনলেন। যে ভাবেই হোক এ যুদ্ধে তাকে জিতেই হবে। মুজাহীদ নেতাদের কানে তিনি এক মন্ত্র ঢুকিয়ে দিলেন। নেতাদের ডেকে বললেন–

"নিশ্চয় আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের প্রাণ ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে। তারা শত্রুসৈন্যদেরকে হত্যা করে নতুবা (যুদ্ধ করতে করতে) নিজেরা মৃত্যুবরণ করে। তাওরাত ইঞ্জিল ও কুরআনে তার কাছে সত্য ওয়াদা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি তার ওয়াদাকে পূর্ণ করবে আল্লাহর পক্ষ হতে তাকে---------"

কাজ হলো এ মন্ত্রে। মুজাহীদরা মরিয়া হয়ে উঠলো। "আল্লাহু আকবার" ধ্বনিতে সমস্ত জাবালে আখদার প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। গোলার শব্দের থেকে সে শব্দ আরো বেশী ভয়ংকর। শত্রু সৈন্যের মনে এক অজানা ভয়ের সঞ্চার হলো। তারা গোলা বারুদ ও অস্ত্র রেখে পিছু হটতে বাধ্য হলো। মুজাহিদরা আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করলো। তাদের মনোবল ও সাহস আরো বেড়ে গেল।

পরাজয়ের গ্লানী মাথায় নিয়ে ইতালীয়রা প্রতিশোধের নেশায় নুতন পথ খুঁজতে লাগলো। তারা ওমর মুখতারের আল্-ফেযানে অবস্থানের কথা জানতে পারলো। একদল দুর্ধর্ষ যুদ্ধবাজ সৈন্য নিয়ে ইতালীয় অফিসার আল্-ফেযান পাহাড়ের দিকে ছুটে গেল। ছোট ছোট গাছে পরিবেষ্টিত সমস্ত পাহাড়-চূড়া থেকে পাদদেশ পর্যন্ত। মরুর বুকে এমন সবুজ দৃশ্য তেমন চোখে পড়ে না। পাহাড়ের এক প্রান্ত থেকে ছোট একটি ঝরনা মিষ্টি সুরে নিচে নেমে এসেছে। পাহাড়ী পাখিরা ঝরনা থেকে পানি খাচ্ছে আর এ গাছ থেকে সে গাছে নেচে বেড়াচ্ছে। ওমর মুখতার রাইফেলে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছিলেন। অল্প বয়সী এক মুজাহীদ এসে তাঁর পাশে দাঁড়ালো। তাঁর মায়া জড়ানো ঘুমন্ত মুখের পানে

কিছুক্ষণ চেয়ে রইল মুজাহীদ। কী আছে এই মুখে! কি সুন্দর শান্ত চেহারা! কে বলবে তিনি একজন বিচক্ষণ ও কৌশলী যোদ্ধা, যার নামে ইতালীর সাধারণ সৈন্যতো দূরের কথা, বড় বড় মেজর-কর্নেল পর্যন্ত অস্থির হয়ে ওঠে। তাদের বুকে কম্পন ধরে।

সাইয়্যেদ ওমর ঃ তাঁর মাথার কাছে বসে ডাকল যুবক। সাড়া দিলেন না ওমর মুখতার। ঘুম একটু গাঢ় মনে হচ্ছে। আর একবার ডাক দিলো যুবক। এবার চোখ মেললেন তিনি। আস্তে আস্তে উঠে বসলেন। শরীরে ঝাঁকি দিয়ে অলসতা ঝেড়ে ফেললেন।

ঃ কী খবর নাসিম!

ঃ ওরা এগিয়ে আসছে।

ঃ কতদূর এসেছে?

ঃ অনেক নিকটে এসে গেছে!

ঃ সংখ্যায় কতজন?

ঃ অনেক। অনেকগুলো মোটরযান।

ঃ ট্যাংক আছে?

ঃ আছে।

ঃ কতটি?

ঃ বলতে পারব না।

ঃ ওরা কি এদিকেই আসছে?

ঃ হ্যাঁ, আমাদের অবস্থানের কথা সম্ভবত ওরা জেনে গেছে।

ঃ ঠিক আছে। মুশফাকের (চিন্তা করো না)

ইস্‌তাই ইসতাইফিজ কুল্লুহুম (সকলকে জাগাও)।

ত্রিশ সেকেন্ডেই সকলে প্রস্তুত হলো যুদ্ধের জন্য।

ঃ শোন– ওমর মুখতার গম্ভীর কণ্ঠে বলতে লাগলেন। পাহাড়ের এই অভ্যন্তর ভাগ হতে আমরা এক্ষুণি সরে যাব। পূর্ব দিকটায় যে ছোট টিলা রয়েছে তার পিছনে আত্মগোপন করবো। ঘোড়াগুলোকে একটু দূরে বেঁধে রাখতে হবে। তবে সাবধান! সুযোগ না এলে কেউ গুলি ছুঁড়বে না।

ইতালী সৈন্যের বহর এক সময় দাঁড়িয়ে পড়লো। ঝট্‌পট্‌ গাড়ি থেকে নেমে পড়লো একজন ক্যাপটেন। বালুর উপর মানুষের ও ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন চোখে পড়লো তার। সে পরীক্ষা করে দেখলো কিছুক্ষণ আগের চিহ্ন এগুলো!

ঃ স্যার শত্রুরা নিকটে কোথাও আছে। পায়ের চিহ্নগুলো একটু আগের।

ঃ কোন দিকে গেছে?

ঃ এদিকে স্যার।

ঃ ওকে, চলো ওদিকে!

ওরা পাহাড়ের পাদদেশে এসে দাঁড়ালো। ক্যাপটেন আবার গাড়ি থেকে নামলো। তার সাথে বেশ কিছু সৈন্যও নামল অস্ত্র হাতে। চোখ কান খোলা রেখে

খুব সন্তর্পণে তারা এগোতে থাকলো। কিন্তু কোথাও কিছু দেখতে পেল না। কোন নিদর্শনও খুঁজে পেল না।

ঃ ক্যাপটেন।

ঃ স্যার।

ঃ কি পেলে?

ঃ কিছুই না স্যার।

ঃ কী বলছ!

ঃ পালিয়েছে স্যার।

ঃ কোথায় পালাবে? ভাল করে খোঁজ।

ঃ ওকে স্যার।

ঃ পায়ের চিহ্ন কোন দিকে গেছে।

ঃ পূর্ব দিকে!

ঃ সে দিকে এগোও।

ঃ গাড়ি নিয়ে এগোনো নিরাপদ নয়।

ঃ তা হলে?

ঃ ও দিকটা দিয়ে ঘুরে যাওয়া উচিৎ।

ঃ তাই চলো। –ওমর মুখতার! তোমার আজ শেষ দিন!!

ওরা গাড়ি ঘুরাল। কিছু দূর গিয়ে ক্যাপটেন আবার নেমে পড়লো। সাতজন সৈন্য নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হলো। এক পা দু'পা করে তারা টিলার নিকটে এলো। দক্ষিণ দিকে একটা বড় বালুর ঢিবি। ক্যাপটেন সৈন্যদের দাঁড় করিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল। হঠাৎ তার মুখে হাসির ঝিলিক দেখা দিল। শত্রুসৈন্য এখানেই আছে। মোক্ষম সময় আজ। এতো কাছে ওমর মুখতারকে কোনদিন পাওয়া যায়নি। ওইতো ওদের ঘোড়া! কি আনন্দে বিশ্রাম নিচ্ছে।

ক্যাপটেন ফিরে এলো। ইশারায় সৈন্যদের কথা বলতে নিষেধ করলো। মেজরের সামনে এসে দাঁড়ালো ক্যাপটেন।

ঃ কী খবর!

ঃ ওরা টীলার অপর প্রান্তে রয়েছে।

ঃ কী করে বুঝলে?

ঃ ওদের ঘোড়াগুলো ওখানে বিশ্রাম নিচ্ছে।

ঃ গুড ক্যাপটেন। ধন্যবাদ তোমাকে। খুব একটা ভাল সংবাদ শুনালে তুমি।

ওমর মুখতার!! দেখি আজ তোমাকে কে আমার হাত থেকে রক্ষা করে! চুরুটে একটি টান দিয়ে সমস্ত সৈন্যকে নেমে পড়ার নির্দেশ দিলেন তিনি।

ঃ ক্যাপটেন।

ঃ স্যার।

ঃ ঐ দিক দিয়ে এগোতে থাক। আর একটা দলকে ওদিকে পাঠাও। আমি যাচ্ছি এদিক দিয়ে। সামনে পেলে জীবিত ধরার চেষ্টা করবে।

ঃ ওকে স্যার।

পিনপতন নিস্তব্ধতা। নিশ্বাসও খুব আস্তে নিচ্ছে মুজাহীদরা। খুব নিকটে শত্রু সৈন্য। একটু বেহিসাব ও অসতর্ক হলে সব ভেস্তে যাবে। ওরা সংখ্যায় অনেক। ভারী অস্ত্রশস্ত্র সাথে। আধুনিক মটরযান, ট্যাংক। সামান্য অসতর্ক ও ভুলের জন্য আজই লিবিয়দের আন্দোলন শেষ হয়ে যেতে পারে।

এক দুই করে প্রহর গুনছেন ওমর মুখতার। খুব নিকটেই শত্রু সৈন্যের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বালুর ঢিবির মধ্যে লুকিয়ে থাকা মুজাহীদদের চোখে পড়া সম্ভব নয় ইতালীয়দের। তারা বুঝতে পারছে না কোথায় লুকিয়ে আছে ওমর মুখতার। এখানে তো তেমন লুকানোর জায়গা নেই।

ঃ কোথায় পালাল তারা ক্যাপটেন?

ঃ বুঝতে পারছি না স্যার।

ঃ সব তো ফাঁকা দেখছি।

ঃ সম্ভবত আমরা ওদের ধোঁকার জালে পা দিয়েছি।

ঃ এক কাজ কর। ওদের ঘোড়াগুলোকে শ্যূট কর।

পায়ে হেঁটে ওরা বেশী দূর পালাতে পারবে না।

আজকেই খেল খতম হবে।

ঃ ওকে স্যার।

ওদের কথা স্পষ্ট শুনতে পারছে ওমর মুখতার।

আর এক মুহূর্ত দেরী করা ঠিক হবে না। ঘোড়াগুলোকে মেরে ফেললে বেঁচে থেকেও মরতে হবে তাদের।

তিনি ইশারায় নির্দেশ দিলেন মুজাহীদদের।

"আল্লাহু আকবার" ধ্বনিতে মরুর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হলো।

এক সাথে অনেকগুলো রাইফেল গর্জে উঠলো।

এতো নিকট থেকে মাটি ফুঁড়ে মুজাহীদরা আক্রমণ করবে ইতালীদের ধারনারও বাইরে ছিল তা।

ওরা কি ভূত না জ্বিন? কোথায় ছিল পালিয়ে! কিছু বুঝে উঠার আগেই তর তাজা স্বাস্থ্যবান সৈন্যদের পুষ্ট দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। গুলি ছোঁড়ার তেমন অবকাশ পেল না তারা। যে সৈন্যরা গাড়িতে বসেছিল তারা গুলি ছুঁড়তে শুরু করলো। কিন্তু তাও অল্পক্ষণ। প্রতিটি গাড়ির তেলের ট্যাংকে গুলি মেরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। গুলি মেরে টায়ারের হাওয়া পাংচার করা হল। একটি গাড়ির

উপর অন্য গাড়ি উঠে বিস্ফোরণ হতে শুরু হলো। এক ড্রাইভারের মাথায় গুলি লাগলো। সে তাল হারিয়ে একটি ট্যাংককে সজোরে ধাক্কা দিল। ট্যাংক উল্টে গেল। তিন চাকার মোটর সাইকেলে বসে মেজর গলা ফাটা চিৎকার দিচ্ছে– ফায়ার, ফায়ার, ফায়ার। এক মুজাহীদ বালুর টিবি সামনে রেখে গড়ান খেতে খেতে অনেকদূরে এগিয়ে এলো। সুযোগ বুঝে মেজরের মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো। মাথার ঘিলু বেরিয়ে ছিটকে পড়লো একদিকে। ড্রাইভার মোটর সাইকেল নিয়ে ভেগে যাওয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু আর একটি গুলি তার বুক ভেদ করে বেরিয়ে গেল।

দশ মিনিটের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হলো। সমস্ত গাড়িতে হুহু করে আগুন জ্বলছে। মুজাহীদরা মৃত সৈনিকদের নিকট হতে অস্ত্রগুলো ছিনিয়ে নিল। ওমর মুখতার মুজাহীদদের সাথে অস্ত্র ছিনিয়ে নেবার কাজে সহযোগিতা করছেন। হঠাৎ এক মুজাহীদ তাঁকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল। সামান্যের জন্য বেঁচে গেলেন তিনি। আগুন জ্বালা এক গাড়ির মধ্য হতে বেরিয়ে এক ইতালী সৈন্য তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে। দ্বিতীয় গুলি ছোঁড়ার আগেই তার দেহ লুটিয়ে পড়লো। দূর দিয়ে একটি গাড়ি ভেগে যাচ্ছিলো। এক মুজাহীদ তার টায়ারে গুলি করলো। চলন্ত গাড়ি তাল হারিয়ে উল্টে গেল। গাড়ির মধ্য হতে দুজন সৈনিক বেরিয়ে এলো। একজন সাধারণ সৈনিক। অন্যজন ক্যাপটেন। খুব অল্প বয়স ক্যাপটেনের। তাদের দুহাত মাথার উপর উঠান। পাশে দাঁড়ান মুজাহীদ তাদের লক্ষ্য করে রাইফেল তাক করল।

ঃ রাইফেল নামাও। নির্দেশ দিলেন ওমর মুখতার– নিরস্ত্রের উপর আক্রমণ করা নিষেধ ইসলামে।

ওমর মুখতার হাত ইশারায় ডাকলেন তাদের। ভয়ে পাংশু ক্যাপটেনের মুখ। সৈন্যটিরও একই অবস্থা। ধীর পায়ে সামনে এগিয়ে এলো তারা। ওমর মুখতার গুলির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত একটি ইতালীয় পতাকা ক্যাপটেনের দিকে এগিয়ে ধরলেন।

ঃ নাও ! এটি তোমাদের পতাকা।

দুনিয়ার বিস্ময় ক্যাপটেনের চোখে। এই সেই ওমর মুখতার! একি মানুষ না দেবতা!! ক্যাপটেনের দুঠোঁট কাঁপছে। কিছু বলতে চাচ্ছে সে। কিন্তু বলতে পারছে না। ওমর মুখতার আবার বললেন–

ঃ নাও।

ক্যাপটেন এগিয়ে এসে নিল পতাকাটি।

ঃ শোন ক্যাপটেন! তোমার জেনারেলকে বলো–

তোমরা বেশি দিন থাকতে পারবে না এদেশে।

ক্যাপটেন ছেঁড়া পতাকা নিয়ে ফিরে গেল। তার চোখে দুনিয়ার বিস্ময়। এই সেই মুজাহীদ নেতা ওমর মুখতার!

॥ ৮ ॥

"ওমর মুখতার! ওমর মুখতার! ওমর মুখতার! – মার্শাল বাদিলিউ – এর কণ্ঠে বিরক্তির ছাপ। চোখ দুটো বড় বড় ও লাল হয়ে উঠেছে।

ঃ কী করছেন আপনারা? - তার সামনে বসা বেশ কজন সিনিয়র অফিসার। নিশ্চুপ তারা। – এভাবে কত পরাজয়ের ঘটনা শুনতে হবে? আমাদের এতোগুলো জোয়ান মারা যাচ্ছে। অথচ তাদের দু'একটিকেও মারতে পারছেন না আপনারা! কেন?

এবারও নিশ্চুপ তারা। মাথা নীচু সকলের।

ঃ জারাজায়ানী!

ঃ স্যার!

ঃ আপনি কি বোবা হয়ে গেছেন?

ঃ স্যার!

ঃ কেন এতো পরাজয়? জাবালে আখদারে পাঁচ দিন ধরে যুদ্ধ করে বীরদর্পে ফিরে এলেন পরাজয়ের গ্লানী নিয়ে! ছি!

ঃ শুধু পরাজয় নয় স্যার। জাগবুব আমাদের হস্তগত হয়েছে।

ঃ শুধু জাগবুব নয়, জাবালে আখদার, কুফ্র, পশ্চিম ত্রিপলি– সমস্ত লিবিয়া আমাদের পদানত হতে হবে।

ঃ হবে স্যার।

ঃ কত দিনে?

ঃ অল্প দিনে স্যার।

ঃ কীভাবে?

ঃ সে ব্যবস্থাই করা হচ্ছে স্যার। ক'দিনের মধ্যেই জাবালে আখদার আমাদের পদানত হবে। ওমর মুখতার-এর-----

ঃ ওমর মুখতার! রেগে উঠলেন বাদিলিউ। কে সে? কী তার পরিচয়?

ঃ স্যার।

ঃ অবসরপ্রাপ্ত কোন সামরিক অফিসার সে?

ঃ না।

ঃ তবে?

ঃ সামান্য একজন স্কুল মাস্টার।

ঃ স্কুল মাস্টার !! যার কাজ কলম চালান। সে আবার অস্ত্র চালায় কিভাবে?

ঃ রণ কৌশলে খুবই অভিজ্ঞ সে।

ঃ স্ট্রেন্জ!!

ঃ স্যার। – অন্য একজন অফিসার মুখ খুল্ল।

ঃ বলুন!

ঃ জনগণ তাকে খুবই মান্য করে? অন্ধের মত বিশ্বাস তাঁর উপর।

ঃ তাই নাকি!!

ঃ শুধু স্কুল মাস্টার নয় সে; সে একজন ধর্ম প্রচারকও! অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে "জেহাদী প্রেরণার" শক্তি সঞ্চার করেছে।

ঃ জেহাদ কী?

ঃ তাদের ভাষায় জেহাদ হল ধর্মযুদ্ধ।

ঃ আই মিন ক্রুসেড।

ঃ ইয়েস স্যার। ওই স্পিরিচুয়াল পাওয়ারই-ই তাদের মূল শক্তি।

ঃ হা-হা-হা-হা-! অত্যাধুনিক অস্ত্রের সামনে স্পিরিচুয়াল পাওয়ার!

ঃ আমাদের অধিকৃত এলাকায় ক্যাথলিক ধর্ম প্রচার করা হোক।

ঃ স্যার!

ঃ ওদের যারা ধর্ম গুরু তাদের উপযুক্ত প্রাপ্য দেওয়া হোক।

ঃ ওকে স্যার।

ঃ স্কুল উপাসনালয় বন্ধের ব্যবস্থা করা হোক।

ঃ ওকে স্যার।

ঃ জারাজায়ানি!

ঃ স্যার।

ঃ নতুন কী পদক্ষেপ নিয়েছেন আপনি?

ঃ বারকা, জাবালে আখদার ও পূর্ব মিসরের সাথে ওমর মুখতারের সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে।

ঃ গুড! আর?

ঃ ফাযান ও কুফর এর সাথেও সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে।

ঃ ওকে! শুনুন! আমি ইতোমধ্যে আরো অস্ত্র, অনেকগুলো ট্যাংক ও কামান পাঠানোর জন্য ইতালীতে লিখে দিয়েছি। শুনে আপনারা খুশি হবেন, অল্প ক'দিনের মধ্যেই ইতালীর বিমান বাহিনীর পনেরটি যুদ্ধ বিমান এসে পৌঁছাচ্ছে ---- ধন্যবাদ স্যার।

ঃ জারাজায়ানী!

ঃ স্যার!

ঃ আমি আগামীকাল ইতালী যাচ্ছি। আপনার উপর দায়িত্ব থাকলো সব কিছুর।

ঃ ওকে স্যার।

ঃ পরাজয় শব্দটি আমি আর শুনতে চাই না।

ঃ ওকে স্যার।

ঃ প্রাণে বেঁচে আসা সেই ক্যাপ্টেন কোথায়?

ঃ বাইরে অপেক্ষা করছে স্যার।

ঃ ডাকুন তাকে।

অল্প বয়সী সেই ক্যাপ্টেন অফিসে স্যালুট দিয়ে প্রবেশ করলো।

ঃ ওমর মুখতারকে তুমি দেখেছ?

ঃ জি স্যার!

ঃ কেমন দেখেছ?

নিরুত্তর কেপ্টেন।

ঃ আই মিন- সে দেখতে কেমন?

ঃ বৃদ্ধ- অতিশয় বৃদ্ধ। কোমর হাল্কা নুয়ে পড়েছে বয়সের ভারে। চোখে গোল চশমা।

ঃ চোখে কম দেখে? ------ কানা। ---- ব্যঙ্গের সুর বাদিলিউ-এর কণ্ঠে।

ঃ সম্ভবত! শান্ত ক্যাপটেন।

ঃ সে তোমার সাথে কেমন আচরণ করেছে?

ঃ দেবতার মতো স্যার।

ঃ হো----- য়া----ট!! দেবতার মত!! নন্‌সেন্স!

নিশ্চুপ ক্যাপটেন।

ঃ তোমাকে কটু কথা বলেনি?

ঃ না।

ঃ অসম্মান করেনি?

ঃ না।

ঃ তবে কী করেছে?

নিশ্চুপ ক্যাপ্টেন।

ঃ স্যার।

ঃ বল।

ঃ তার দেহরক্ষী আমাকে গুলি করতে গেলে তিনি তাকে নিষেধ করেন। এবং বলেন-

ঃ কি বলে?

নিশ্চুপ ক্যাপটেন। মাথা নীচু তার।

ঃ বল--- কী বলে সে?

একটি ঢোক গিল্‌লো ক্যাপ্টেন। ভয় পাচ্ছে সে।

ঃ স্যার।

ঃ বল। রূঢ় কণ্ঠ মার্শাল বাদিলিউ -এর।

ঃ তিনি বলেন- নিরস্ত্রকে আঘাত করার অনুমতি নাই ইসলামে।

মার্শাল বাদিলিউ একটি হুঁচোট খেলেন।

এ ধরনের কথা শুনতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।

ঃ স্যার!

ঃ ইয়েস!

মাটিতে পড়ে থাকা গুলিতে ক্ষত বিক্ষত পতাকাটি তিনি নিজ হাতে উঠালেন।

ঃ ওটিকে সে পদাঘাত করেছে?

ঃ না স্যার।

ঃ তবে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে?

ঃ না স্যার।

ঃ তবে?

ঃ আমাকে কাছে ডেকে সেটি আমার হাতে উঠিয়ে দিলেন।

ঃ স্ট্রেন্‌জ!

ঃ তারপর!

ঃ তারপর, তিনি বললেন,–

"তোমার জেনারেলকে বলো বেশিদিন এখানে থাকতে পারবে না।"

ঃ ব্লাডি বাস্টার্ড! এতো বড় স্পর্ধা! রাগে ফেটে পড়লেন বাদিলিউ। ক্যাপ্টেন একবার তার অফিসারের দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করলো। মনে মনে সে দুই সামরিক অফিসারের চরিত্র বিশ্লেষণ করলো। দুজন সম্পূর্ণ দু'মেরুর মানুষ। একজনের মধ্যে আছে মানবতা, ধর্মীয় চেতনা ও স্বদেশ রক্ষার প্রচেষ্টা। অন্য জনের মধ্যে রয়েছে পশু প্রবৃত্তি অধর্মীয় চেতনা এবং বিদেশ আগ্রাসনের প্রচেষ্টা। কত তফাৎ দুজনের চরিত্রে! এক জনকে দেখলে শ্রদ্ধায় মাথা অবনত হয়। অন্য জনকে দেখলে ঘৃণায় মন জ্বলে যায়, যে অমানুষিক অত্যাচার ও আচরণ নিরপরাধ লিবিয়ার মানুষদের উপর করা হচ্ছে– তা কি মানুষের কাজ!! খ্রিস্ট ধর্মেও তো এমন কাজকে ঘৃণা করা হয়।

প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর! ক্যাপটেনের চোখের কোণ হাল্কা ভিজে এলো।

ঃ ক্যাপ্টেন।

ঃ স্যার।

ঃ সেকি আর কোন কথা বলেছিল?

নিশ্চুপ ক্যাপটেন। মাথা আরো নীচু হলো তার।

ঃ চুপ রয়েছো কেন? বল।

ঃ স্যার বলেছিল---- থেমে গেল ক্যাপ্টেন।

ঃ নির্ভয়ে বল এবং সত্য বল।

ঃ স্যার বলেছিল------

" এ বালক ছেলে। কোন দোষ করেনি সে।

তাকে দিয়ে করান হচ্ছে----------"

ঃ আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি এখন যাও।

স্যালুট দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন। পা অগ্রসর হতেই আবার ডাকলেন তিনি!

ঃ সেই পতাকাটি কোথায়?

ঃ আমার পকেটে স্যার।

ঃ ওটি আমাকে দাও।

ক্যাপ্টেন পতাকা রেখে কক্ষান্তর হলো।

অফিস কক্ষে কিছুক্ষণ থমথমে ভাব বিরাজ করল।

মার্শাল বাদিলিউ প্রথম মুখ খুললেন।

ঃ আপনারা এখন আসুন।

সকলে বেরিয়ে গেলে তিনি পতাকাটি টেবিলের উপর মেলে ধরলেন। পাঁচ ছয়টি ছিদ্র হয়েছে পতাকায়।

অনেক্ষণ পতাকার দিকে চেয়ে রইলেন তিনি।

অজান্তেই একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার।

## ॥ ৯ ॥

চতুর্দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও ওমর মুখতার দমে গেলেন না। আশাহতও হলেন না। কোন ঘটনাও তাঁর উপর কোন প্রভাব ফেললো না। তিনি পূর্বের ন্যায় অবিচল। ঠোঁটের কোনে মিষ্টি হাসি। মুখে আশার বাণী। আল্লাহর উপর অবিচল বিশ্বাস। নবীর আদর্শে উজ্জীবিত। তিনি জেহাদ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। তাঁর কাজ চেষ্টা করা। সাহায্য আসবে উপর থেকে। একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে তিনি শত্রুদের নাস্তানাবুদ করতে লাগলেন।

১৯২৮ সালের ২২ এপ্রিল। মুজাহীদদের নিয়ে তিনি ফজরের সালাত আদায় করলেন। তারপর অনুগত বাহিনীকে সংক্ষেপে বললেন–

"আজ আমরা শত্রুদের শক্তঘাঁটি 'দারনা'তে আক্রমণ করবো। আপনারা জানেন, আমরা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। সমস্ত এলাকার সাথে যোগাযোগ বন্ধ প্রায়। কিন্তু তাই বলে বসে থাকলে চলবে না। আমাদের কাজ আমরা করে যাব। বিজয় আল্লাহর থেকে। আপনাদের মনে কি কোন রকম সংশয় আছে?"

ঃ না।–সমস্বরে মুজাহীদদের উত্তর।

ঃ তা হলে এখুনি রওনা হব আমরা।

ঃ ইনশাআল্লাহ।

ঃ ইয়া আল্লাহ, হায়্যে বিলা।

ঘন্টাখানেকের মধ্যে মুজাহীদ বাহিনী দারনা দূর্গে পৌছে গেল। সুবিধাজনক জায়গায় অবস্থান নিয়ে আক্রমণ শুরু করলো তারা। শুরু হলো রক্তক্ষয়ী মরণপণ যুদ্ধ। একদিকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভারি অস্ত্রে সজ্জিত বাতিল আগ্রাসী বাহিনী, অন্য দিকে রাইফেল হাতে সাধারণ কজন অশিক্ষিত অর্ধ শিক্ষিত মানুষ। এক দিকের সৈন্যদের মনে আধুনিক অস্ত্রের অহমিকা, অন্যদিকের বাহিনীর বুকে ঈমানী বল।

যুদ্ধ চললো পুরো দু'দিন ধরে। শত্রুসৈন্য পরাজয় বরণ করলো। চরম পরাজয়। একদিকে তারা যেমন হারাল অনেকগুলি তাজা প্রাণ, অন্যদিকে তেমনি হারাল অনেক সামরিক যান। কয়েকটি কামান, অসংখ্য গোলা-বারুদ এবং ক'টি ট্যাংক। এই বিজয় মুজাহীদদের মনে আশার আলো সঞ্চার করলো। তাদের মনোবল আরো বেড়ে গেল।

এদিকে সাল্লুম এলাকা হতে শত্রু বাহিনীর কঠোর পাহারা ও অবরোধের মাঝ দিয়ে বীরের মত যুদ্ধ করে একদল মুজাহীদ ওমর মুখতারের জন্য খাদ্যদ্রব্যসহ অন্যান্য দ্রব্যাদি নিয়ে রওনা হল। গোপন সংবাদ পেয়ে ইতালী বাহিনী তাদের গতিরোধের জন্য একদল সৈন্য পাঠাল। মুজাহীদরা তাদের অগ্রগতির খবর পেয়ে পূর্ব থেকে ওৎপেতে থাকলো, তারপর সুযোগ বুঝে গুলি ছুড়ে তাদের গাড়ির চাকাগুলো সব নষ্ট করে দিল। মরুর উত্তপ্ত বালুর বুকে ইতালী বাহিনী তখন দিশেহারা। সামনে এগোলে যেমন শত্রুদের গুলিতে প্রাণ দিতে হবে; তেমনি পিছনে ফিরতে থাকলেও মরুর উষ্ণতায় তৃষ্ণায় মরতে হবে। অগত্যা সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের বসে থাকা ছাড়া পথ রইল না।

আইনুল গাযালাতে জারাজায়ানী ওমর মুখতারের হাতে চরমভাবে মার খেল। জারাজায়ানী চরমভাবে হতাশ হলো যেমন, তেমন আশ্চর্যও হলো। সবদিকে সহযোগিতা ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ক'জন মানুষ সাধারণ ক'টি অস্ত্র নিয়ে তাদেরকে নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছে! আর তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে এক বৃদ্ধ স্কুল মাস্টার। কোথায় পেল সে এতো শক্তি। কোথায় পেল এমন মনোবল'?

১৯ সেপ্টেম্বরের কথা। জারাজায়ানী জাছা থেকে তার সৈন্য বাহিনীকে কুবার দিকে মুভ করালেন। উদ্দেশ্য মুজাহীদদেরকে একেবারে অবরুদ্ধ করা। কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হলো না। 'ওয়াদি সাফিয়া' নামক স্থানে তারা মুজাহীদদের বাঁধার সম্মুখীন হলো। ২০ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ শুরু হলো।

ছোট একটি পাহাড়ের অপর প্রান্তে মুজাহীদ বাহিনী। সামনের দিকে বেশ কয়েকটি বাঙ্কার খুঁড়ে তার মধ্যে সম্মুখ বাহিনী। বাঙ্কার দেখে বুঝার উপায় নাই এখানে কোন মানুষ আছে। উপর নিচে সবদিকেই বালি। একদিকে শুধু ছোট একটি গর্ত –আসা-যাওয়ার জন্য। সেই গর্তের মুখে অস্ত্র তাক করে বসে আছে সাহসী ক'জন মুজাহীদ।

জারাজায়ানী বাহিনী এগিয়ে আসছে বিশাল এক বহর নিয়ে। সাত-আটটি ট্যাংক। বিশ-পঁচিশটি মটরযান, কামানও রয়েছে বেশ কয়েকটি। একটি খোলা জীপে চড়ে জারাজায়ানী চুরুট টানছে আর ওমর মুখতারকে বন্দি করার স্বপ্ন

দেখছে। হঠাৎ তার স্বপ্ন ভঙ্গ হল। মরুর বালু ভেদ করে ঝাঁক ঝাঁক গুলি তাদের অনেকগুলো সৈনিকের তাজা দেহকে রক্তাক্ত করে দিলো। ড্রাইভারের নিয়ন্ত্রণ হারানোর ফলে কয়েকটি গাড়ি উল্টে গেল। মুজাহীদ বাহিনী পেট্রোল বোমা ও গুলি মেরে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলো। হঠাৎ এমন আক্রমণ দেখে জারাজায়ানী প্রথমে হতভম্ব হয়ে পড়লেন। তারপর চিৎকার ছাড়লেন–

ঃ ফায়ার, ফায়ার। ক্যাপটেন ফারনান্ড!

ঃ স্যার।

ঃ তোমার আর্টিলারী বাহিনীকে রেডি কর।

ঃ ইয়েস স্যার।

ঃ কুইক। এখনই মোক্ষম সময়।

ঃ ওকে স্যার।

ঃ ক্যাপটেন ভারিদা!

ঃ স্যার।

ঃ ট্যাংক বাহিনীকে এ্যাডভান্স হতে বল।

ঃ ওকে স্যার।

ঃ শোন।

ঃ স্যার।

ঃ ট্যাংককে অবলম্বন করে সৈন্যদের অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দাও।

ঃ ওকে স্যার।

বয়োবৃদ্ধ মুজাহীদ সাইয়্যেদ ফাদিল বো ওমর। ওমর মুখতারের পাশে সব সময় ছায়ার মত অবস্থান করেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, সাহসী ও যুদ্ধবাজ। বয়স তার কাজেকর্মে একটুও বাধ সাধতে পারেনি। যুবকের মত দীপ্ততা তার দেহ-মনে। একের পর এক তিনি গুলি ছুড়ে যাচ্ছেন। নির্ভুল নিশানা। এক একটি গুলিতে এক একটি ইতালী সৈন্য লাশ হয়ে মরুর বালু লাল করছে।

ঃ ফাদিল বো-ঐ যে, ঐ দিকটায়।

ঃ চিন্তা করবেন না, আপনি ওদিকটায় দেখুন।

ঃ আচ্ছা। কিন্তু ফাদিল বো!

ঃ বলুন।

ঃ ওরা দেখছি অন্যপথ অবলম্বন করছে।

ঃ কি?

ঃ সৈন্য বাহিনীকে পিছিয়ে নিচ্ছে।

ঃ হ্যাঁ। তাইতো দেখছি।

ঃ সম্ভবতঃ ওরা ট্যাংক-কে আড়াল করে অগ্রসর হবে।

ঃ তা হলে তো উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ক'জন মুজাহীদ পাঠাতে হয়।

ঃ ঠিক বলেছেন। ট্যাংক-কে আড়াল করে এগোতে থাকলে- দুদিক থেকে তারা গুলি করবে।

ঃ আপনি ও দিকটা দেখুন। আমি পাঠাচ্ছি।

ঃ খুব সাবধানে যেতে হবে কিন্তু।

ঃ ঠিক আছে।

জারাজায়ানীকে উন্মাদের মত লাগছে। চোখের সামনে একের পর এক লাশ পড়ে যাচ্ছে। অথচ তারা কিছুই করতে পারছে না।

ঃ মেজর নাতালী!

ঃ স্যার।

ঃ দেখতে পারছেন না- কীভাবে আমাদের জোয়ানগুলো পড়ে যাচ্ছে?

ঃ স্যার, হঠাৎ এভাবে আক্রান্ত হবো বুঝতে পারিনি।

ঃ যান, সৈন্যদের একত্রিত করে শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করে দিন।

ঃ ওকে স্যার। আর ভয় নাই। ওই দেখুন ট্যাংক বহরের আড়ালে আমাদের সৈন্যরা এ্যাডভ্যান্স হচ্ছে। আর্টিলারী বাহিনীও তৈরি স্যার।

ঃ কুইক।

ঃ ওকে স্যার।

ঃ মেজর নাতালী! কী দেখছি আমি?

ঃ স্যার।

ঃ ও দিকে তাকাও।

ঃ ও গড। ও দিকেও ওরা ওৎ পেতে আছে!

ট্যাংক-কে আড়াল করে অগ্রসর হওয়া আমাদের সব সৈন্যতো পড়ে গেল স্যার।

ঃ ননসেন্স! ও গড! যাও, শুধু ট্যাংক বাহিনীকে অগ্রসর হতে বল। শত্রুদের মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে বল। যাও, কুইক।

ঃ ওকে স্যার।

মেজর নাতালী দু'পা অগ্রসর হতেই তার তাজা দেহ মাটিতে পড়ে গেল। মাথার ঘিলু বেরিয়ে গেছে তার। মেজর জেনারেল জারাজায়ানী চোখ বুজলেন। অজান্তে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, "ও গড"!

ঃ সাইয়্যেদ ওমর!

ঃ বলুন।

ঃ আমরা সফল হয়েছি।

ঃ আল্লাহর মেহেরবাণী।

ঃ ওরা আর অগ্রসর হচ্ছে না।

ঃ কিন্তু ট্যাংক অগ্রসর হচ্ছে।

ঃ হ্যা, তা অবশ্য ঠিক।

ঃ কিন্তু ট্যাংকের গতিরোধ করার মত শক্তি তো আমাদের যৎসামান্য।

ঃ ও দিয়েই আমরা প্রতিরোধ করবো।

ঃ ফাদেল বো।

ঃ বলুন।

ঃ দেখছেন, বাঙ্কারে থাকা আমাদের মুজাহীদদেরকে যে ওরা মাটির মধ্যেই দাফন করলো।

ঃ হায় আল্লাহ!

ঃ কিছু একটা করতে হবে এখুনি।

ঃ আপনি পেট্রোল বোমা ছোঁড়ার ব্যবস্থা করুন। আমি অন্যভাবে সাইজ করছি।

ঃ কী করছেন আপনি।

ঃ চিন্তা করবেন না। ট্যাংকের গতিরোধ করতেই হবে। দেখছেন না, কামানের গোলাও এসে পড়তে শুরু করেছে। ফাদিল বো টিলার শীর্ষে উঠে পেট্রোল বোমা ও গুলির সাহায্যে দুটি ট্যাংক উল্টে দিলেন। কিন্তু হঠাৎ একটি গুলি এসে তার বুক ভেদ করে বেরিয়ে গেল। নিচে গড়িয়ে পড়লেন তিনি। ওমর মুখতার দৌড়িয়ে এলেন।

ঃ একি করলেন ফাদেল বো।

ঃ চিন্তা করবেন না সায়্যেদ ওমর। আপনি ও দিকটায় দেখুন। ওরা ভাগতে শুরু করেছে। সায়্যেদ ওমর।

ঃ বলুন।

ঃ এটি নিন।

জামার আস্তিনের মধ্য হতে কাপড়ে জড়ানো বই আকারের কিছু একটা দিলেন তিনি।

ঃ আমার একটি ছোট ছেলে আছে। তাকে এটি পৌঁছে দিবেন।

ঃ ফাদিল বো!

ঃ আপনি ও দিকটা দেখুন। ওই দেখুন– কত মানুষ! সাদা পোশাক পরা, এগিয়ে আসছে আমাকে নিতে। সকলের মুখে হাসি! ওরা আমাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। ওদের হাতে হাতে ফুলে তোড়া। ঠোঁটে মিষ্টি হাসি। ওরা বলছে–

আহ্লান ওয়া সাহ্লান। এসো হে বীর। তোমাকে লক্ষ কোটি সালাম।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূ...।

ওমর মুখতার চেয়ে রইলেন। নিষ্পলক নির্বাক চাহনী। চোখ দুটো বন্ধ করে দিলেন তিনি।

এখন আর গোলার শব্দ শোনা যাচ্ছে না। শত্রু বাহিনী পিছু হটে গেছে। এই যুদ্ধে জারাজায়ানী বাহিনী চরম পরাজয় ও প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তারা পাঁচশত সৈন্য হারায়– যার মধ্যে একজন মেজর ও তিনজন বিভিন্ন র‍্যাংকের অফিসার ছিল। অন্যদিকে মুজাহীদদের পক্ষে মাত্র চল্লিশ জন শহীদ হন।

মুজাহীদ বাহিনী ফিরে আসছে এ সংবাদ জানতে পেরে গ্রামের সর্বস্তরের মানুষ তাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। আনন্দে দফ বাজাচ্ছে কেউ। কেউ উলুধ্বনি দিচ্ছে। মুজাহীদরা ঘোড়া থেকে নেমে কেউ নিজের ছোট বাচ্চাকে জড়িয়ে ধরছে। কেউ এসে মায়ের হাতে চুমা খাচ্ছে। অনেকে স্ত্রীর সাথে প্রণয়ের দৃষ্টি বিনিময় করছে।

তিন বছরের ছেলে আব্দুল্লাহ। সকলের সাথে সেও দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে তার মা। পিতা, স্বামী ও সন্তানকে নিয়ে সকলে হাসিমুখে ঘরে প্রবেশ করলেও আব্দুল্লাহ দাঁড়িয়ে রইল। মায়ের দিকে একবার জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাল সে। মা আড়ালে মুখ লুকাল।

ঃ সকলের আব্বু এসেছে। আমার আব্বু কোথায় আম্মি? মহিলা নিরুত্তর। কান্না থামাতে পারছেন না তিনি।

ঃ আম্মি! আব্বু আসেনি কেন?

মহিলা এবার নিজেকে সামলাতে পারলেন না। হু হু করে কেঁদে ফেলেন। আব্দুল্লাহ কিছুই বুঝলো না। আম্মু কাঁদতে পারে এমন কোন কথা তো সে বলেনি। তবে আম্মু কাঁদছে কেন?

ঃ আম্মি! কাঁদছো কেন?

ঃ আয় বাবা! আমার কোলে আয়!

ঃ আম্মি! আব্বু কি শহীদ হয়েছেন?

ঃ আব্দুল্লারে!! আয় বাবা-আমার বুকে আয়।

ওমর মুখতারের তখন অজু করা শেষ প্রায়। তার তাঁবুর সামনে এক মহিলা এসে দাঁড়ালেন। পাশে ছোট বাচ্চা। ফুটফুটে চেহারা। চোখ দুটি পিট পিট করছে।

ওমর মুখতার জিজ্ঞাসার নেত্রে মহিলার দিকে তাকালেন।

ঃ আমার স্বামী কোথায়?

ঃ কে তোমার স্বামী?

ঃ ফাদেল বো।

ওমর মুখতার মাথা নত করলেন। তারপর উঠে গিয়ে সেই বইটি আনলেন। আব্দুল্লাহ ওমর মুখতারকে দেখছে। চোখে বিস্ময় তার। কে এই লোক? হাত ইশারায় আব্দুল্লাকে ডাকলেন তিনি।

ঃ কি নাম তোমার?

ঃ আব্দুল্লাহ।

ঃ বা! খুব মিষ্টি নাম। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন ওমর মুখতার।

ঃ তুমি কে?

ঃ আমি ওমর মুখতার।

ঃ ওমর মুখতার!!!

মাথা নাড়ালেন ওমর।

ঃ তুমি তাকে চেন?

মাথা নাড়াল আব্দুল্লাহ। মুখে মিষ্টি হাসি। আরো একবার আদর করলেন তাকে।

ঃ আমার বন্ধু হবে আব্দুল্লাহ?

ঃ হবো।

আব্দুল্লাহ আরো একটু এগিয়ে এসে ওমর মুখতারের চশমা খুলে নিজের চোখে পরার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। ওমর মুখতার তাকে সাহায্য করলেন।

ঃ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

হাসলো আব্দুল্লাহ। খুব মিষ্টি হাসি।

ঃ এটি নাও।

ঃ কি এটি?

ঃ তোমার আম্মুকে দাও। এটি মুছহাফ (কোরআন)। তোমার আব্বু বলেছেন, এই মুছহাফে যে ভাবে চলতে বলা হয়েছে – তুমি সেভাবে চলবে বড় হলে। চলবে তো?

ঃ চলবো।

আব্দুল্লাহ মুছহাফটি তার মায়ের হাতে উঠিয়ে দিল। মা মুছহাফটি হাতে নিয়ে তাতে ভক্তি ভরে চুমু খেলেন। তারপর কাঁদতে কাঁদতে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলেন। আব্দুল্লাহ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল।

ঃ বন্ধু।

হাসলো আব্দুল্লাহ।

ঃ চলো ঘুরে আসি।

তাঁবু থেকে বের হলেন ওমর মুখতার। অদূরে একটি গাছের নিচে ক'জন মুজাহীদ নেতা বসে কথা বলছিল। ওমর মুখতার তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। আব্দুল্লাহ অদূরে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি তাকে ডাকলেন।

ঃ আব্দুল্লাহ!

আব্দুল্লাহ এগিয়ে এলে তিনি সকলের সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

ঃ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, নাম আব্দুল্লাহ।

মুজাহীদ নেতারা তাকে কাছে নিয়ে আদর করলেন।

ঃ ফাদেল বো-এর সন্তান।

ঃ আল্লাহ তাকে জান্নাত নসীব করুন।

আব্দুল্লাহ মুজাহীদদের পাশে পড়ে থাকা একটি অস্ত্র উঁচু করে ধরে তার স্বরে চিৎকার দিল–

"আল্লাহু আকবার।"

ওমর মুখতারসহ সকল মুজাহীদ নেতা তার দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে রইলেন।

## ॥ ১০ ॥

অদি সাফিয়ায় চরম পরাজয়ের পর জেনারেল জারাজায়ানী হন্যে হয়ে উঠলেন। প্রতিশোধ নেওয়ার নেশা তাকে অস্থির করে তুললো। ওমর মুখতারকে ধরার জন্য এমন কোন চেষ্টা ও কূটকৌশল নেই যা যিনি করতে বাদ রাখলেন।

এ দিকে ওমর মুখতার তাঁর কার্যক্রম মিসর সীমান্তের দাফনা এলাকার দিকে সম্প্রসারণ করলেন। উদ্দেশ্য হলো মিসরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা। খাদ্যদ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করা। কিন্তু জারাজায়ানী সে পথও বন্ধ করে দিল। মিসর সীমান্ত বরাবর তারা কাঁটাতারের বেড়া দিল। প্রায় তিনশ কিলোমিটার লম্বা সেই বেড়া দিতে এক বছরের বেশি সময় লেগেছিল। এই তারের বেড়া দেওয়ার ফলে ওমর মুখতার সমস্ত মানুষ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তিনি বহুবার বহু চেষ্টা করেও ওই কাটাতারের বেড়া অতিক্রম করতে ব্যর্থ হন।

ইতালীয়রা সমস্ত কাঁটাতার জুড়ে রাতভর বিদ্যুৎ বাতির ব্যবস্থা রাখার সাথে সাথে রাখে কড়া পাহারা। সাঁজোয়া গাড়ির সাথে বিমান দ্বারাও এই তিনশো কিলোমিটার এলাকা পাহারা দেবার ব্যবস্থা করা হয়।

কিন্তু অকুতোভয় এই বীর এতেও দমলেন না। ইতালীদের তাড়া খেয়ে যেমন এদিক সেদিক পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন, তেমনি সুযোগ বুঝে অতর্কিতে জারাজায়ানী বাহিনীর উপর আক্রমণ করে তাদেরকে অতিষ্ঠ করে তুললেন।

১৯৩০ সালের অক্টোবর মাস। ওমর মুখতার মুজাহীদদের সাথে এক পাহাড়ের পাদদেশে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মুজাহীদ বাহিনী। বালুর উপর শুয়ে অনেকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওমর মুখতারও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কদিন ধরে শরীরটা ভালো যাচ্ছিলো না। সকলে ঘুমিয়ে পড়লেও ইসমাইলের ঘুম আসছিল না। মায়ের কথা মনে পড়ছিল খুব। মা এখন কেমন আছে? তারতো দেখার কেউ নেই। কীভাবে চলছে তার। কেঁদে কেঁদে শেষে চোখ দুটো অন্ধ করে ফেলবে নাতো!

ঘুমন্ত ওমর মুখতারের দিকে একবার তাকালো ইসমাইল। খুব মায়া হলো তার। সত্তুর ঊর্ধ্ব এই বৃদ্ধ চব্বিশ ঘণ্টা কীভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। কোন ক্লান্তি নাই। কোন সমস্যায় বিচলিত নন। আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস। নবীর আদর্শই তার জীবনের মূলমন্ত্র।

হঠাৎ তার চিন্তায় ছেদ পড়লো। কান খাড়া করলো ইসমাইল। হ্যাঁ একটা শব্দ কানে ভেসে আসছে। কিসের শব্দ হতে পারে? আরো কান খাড়া করলো। এবার স্পষ্ট শুনতে পেল সে মোটরযানের শব্দ। ক্রমেই নিকটে আসছে বলে মনে হচ্ছে। তা হলে কি ইতালীরা আমাদের গোপন আস্তানার খবর জেনে গেছে! এখন উপায়?

ওমর মুখতারের নিকট গেল ইসমাইল। ঘুমন্ত ক্লান্ত এই মানুষটিকে জাগাতে তার খুব মায়া হচ্ছিল। তবুও না জাগিয়ে উপায় নেই। কপালে হাত রেখে সে ওমর মুখতারকে ডাকলো।

ঃ সাইয়্যেদ ওমর। সাইয়্যেদ ওমর!! চোখ মেললেন ওমর মুখতার।

ঃ সাইয়্যেদ ওমর!

ঃ ইসমাইল! তুমি ঘুমাওনি?

ঃ শ-শব্দ। শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ঃ কিসের শব্দ?

ঃ মোটর যানের।

লাফ মেরে উঠে বসলেন ওমর মুখতার। রাইফেল ধরে পাশের মুজাহীদকে গুঁতো দিলেন। তিনিও লাফ মেরে উঠে বসলেন। ইসমাইল ত্বরিৎগতিতে সকল মুজাহীদকে জাগিয়ে উঠালেন। একজন মুজাহীদ পাহাড়ের উপরে উঠে ইতালী সৈন্যদের গতিবিধি লক্ষ্য করে নীচে নামলো।

ঃ কী খবর রাশিদ?

সাইয়্যেদ ওমর! ওরা সংখ্যায় অনেক। ট্যাংকসহ অনেক মোটর যান।

ঃ কত দূরে?

ঃ খুব নিকটে এসে গেছে।

ঃ ওরা কি আমাদের সন্ধান পেয়েছে?

ঃ আমার তাই মনে হচ্ছে।

ঃ কেন?

ঃ ওরা পাহাড়টিকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে।

ঃ চার ভাগে বিভক্ত হয়ে পড় রাশিদ।

ঃ হাদের সাইয়্যেদ।

ঃ দু'দল শীর্ষে। দু'দল পাহাড়ের দু পাশে। ওদের বাধা দিতে হবে ও ভাগতে হবে আমাদের। বেশিক্ষণ মোকাবেলা করা যাবে না।

ঃ আমরা কি এখনই আক্রমণ করবো?

ঃ আমাদের রেঞ্জের মধ্যে এলেই করবে।

ঃ হাদের।

ইতালী বাহিনী হঠাৎ থেমে গেল। জেনারেল জারাজায়ানী তার অধিনস্ত অফিসারদেরকে কি যেন নির্দেশ দিলেন। অফিসাররা সমস্ত সৈন্যদেরকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করল। দশ বার জনের একটি দল মুজাহীদদের সন্ধানের জন্য খুব সতর্কতার সাথে সামনে অগ্রসর হতে থাকলো। কিছুদূর অগ্রসর হতেই তারা ঘোড়ার কাঁচা পায়খানা দেখতে পেল। দাঁড়িয়ে পড়লো তারা। আরো সতর্কতার সাথে তারা কিছুদূর অগ্রসর হল। পাহাড়ের পাদদেশে তারা অনেকগুলো ঘোড়া দেখলো। মুজাহীদরা ঘোড়াগুলো সরানোর অবকাশ পায়নি। সৈন্যগুলো খুব দ্রুত ফিরে গেল।

ঃ স্যার।

ঃ কি খবর ক্যাপটেন?

ঃ অনেকগুলো ঘোড়া পাহাড়ের পাদদেশে।

ঃ তা হলে ওরা সামনেই রয়েছে?

ঃ তেমনই মনে হয় স্যার।

ঃ ওকে! এ্যাডভ্যান্স এন্ড ফায়ার।

জারাজায়ানীর নির্দেশের সাথে সাথে ইতালী বাহিনী পজিশন নিয়ে অগ্রসর হতে শুরু করলো। শুরু হলো যুদ্ধ।

বিচক্ষণ ওমর মুখতার বুঝলেন আজ সম্মুখ সমরে বেশিক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব নয়। প্রথমত জনবলে তারা খুবই কম। দ্বিতীয়ত তাদের প্রতিরোধ করার মত যথেষ্ট গোলা-বারুদ ও ভারী অস্ত্র কাছে নাই। তাই মুজাহীদ বাহিনীকে তিনি নির্দেশ দিলেন পিছু হটার জন্য। মুজাহীদ বাহিনী অত্যন্ত কৌশলে যুদ্ধ করতে করতে পিছু হটতে শুরু করলো। কিন্তু যত সহজে তারা পিছু হটতে চেয়েছিল তত সহজে পারলো না। অনেকগুলো তাজা প্রাণ তাদের বিসর্জন দিতে হলো। বৃষ্টির ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি। তার সাথে জোড়া দিয়েছে কামানের গোলা। দানবের মত সবকিছু মাড়িয়ে ট্যাংক বাহিনী এগিয়ে আসছে। অতি কষ্টে অল্প কিছু মুজাহীদ নিয়ে ওমর মুখতার শত্রুদের গুলি বর্ষণের বাইরে আসতে সক্ষম হলেন। দূর থেকে জারাজায়ানী তা দেখতে পেয়ে এক অফিসারকে নির্দেশ দিলেন–

ঃ ঐ দেখ অফিসার। ওমর ভেগে যাচ্ছে। ফলো হিম এন্ড কিল।

ঃ ওকে স্যার।

ঃ শোন।

ঃ স্যার।

ঃ ওকে চারিদিকে থেকে ঘিরে ধর। কুইক মুভ।

ঃ ওকে স্যার।

শত্রু বাহিনী পিছু ধাওয়া করলো ওমর মুখতারের। দেখতে দেখতে তিন দিক থেকে শত্রুবাহিনী তাদেরকে ঘিরে ধরলো। পালানোর পথ শুধু এক দিকে এখন, দক্ষিণ দিকের দিগন্ত জোড়া তপ্ত মরুভূমি।

ঃ হে আল্লাহর সৈনিকেরা এদিকে এসো। ওমর মুখতার তার সহচরদের বললেন।

ঃ ওরা তো তিন দিক থেকে আমাদের ঘিরে ধরেছে।

ঃ সেজন্যই দক্ষিণে।

ঃ হাদের সাইয়্যেদ ওমর।

দক্ষিণ দিকে সরতে শুরু করলো মুজাহীদ বাহিনী। সামনে একটি হালকা উঁচু বালুর ঢিবি। তার উপর দিয়েই তাদেরকে এগোতে হবে। পিছন দিক হতে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আসছে। যে কোন মুহূর্তে তার একটি এসে পিঠ ফুটো করে দিতে পারে। ঢিবির উপর থেকে নিচে নামতে গিয়ে ওপর মুখতারের ঘোড়া ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তার পিছনের পায়ে গুলি লেগেছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে বালি। দীর্ঘ দিনের অনুগত ঘোড়া মনিবের বিপদ সে বুঝতে পেরেছে। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো ঘোড়া। পারলো না। পায়ের হাড় ভেঙে গেছে। অন্য মুজাহীদরা ততক্ষণে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। পিছনে কী ঘটেছে তা তারা দেখতে পেল না। শুধু ইসমাইল এ ব্যাপারটি বুঝতে পারলো। সে তার ঘোড়া দাঁড় করালো। ক্ষিপ্রগতিতে পিছিয়ে এলো। মাথার উপর দিয়ে শা শা শব্দ করে গুলি চলে যাচ্ছে। ওমর মুখতার ঘোড়া থেকে আট দশ হাত দূরে পড়ে আছেন। কোমরে প্রচন্ড ব্যথা পেয়েছেন তিনি। উঠতে পারছেন না। আহত ঘোড়ার দিকে চেয়ে তার চোখে পানি চলে এলো। অবলা প্রাণী মনিবের দিকে তাকিয়ে অঝোরে কাঁদছে। তিনি অতিকষ্টে উঠে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘোড়ার নিকটে এলেন। ওর অশ্রু মুছিয়ে দিলেন। এখন কি করবেন ভাবছেন তিনি। অন্য মুজাহীদরা অনেকদূর এগিয়ে গেছে। চিৎকার দিলেও তারা শুনতে পারবে না। আশেপাশে কোন গুহাও নাই যে, সেখানে আত্মগোপন করা যায়। তা হলে শত্রুর হাতে কি আজই ধরা পড়তে হবে?

ঃ সাইয়্যেদ ওমর।

পিছনে ফিরলেন ওমর মুখতার। ইসমাইল দাঁড়িয়ে পিছনে।

ঃ তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন ঘোড়ায়।

ঃ ইসমাইল তুমি?

ঃ সময় নষ্ট করবেন না সাইয়্যেদ।

ঃ তুমি আগে উঠ।

ঃ মালিশ (দুঃখিত) আপনিই আগে উঠুন। আর একটু দেরি করলেই ধরা পড়তে হবে। ওরা বালুর ঢিবির অপর প্রান্তে পৌছে গেছে। উঠে পড়ুন।

ওমর মুখতার ঘোড়ার জিনে পা দিয়ে উঠার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। প্রচন্ড ব্যথা কোমরে। মনে হচ্ছে মেরুদন্ডের কোন হাড় ভেঙে গেছে। ইসমাইল তাঁকে উঠতে সাহায্য করলো।

ঃ তুমি উঠে পড় এবার।

ঃ আমার উঠতে হবে না সাইয়্যেদ।

ঃ না ইসমাইল তা হয় না।

ঃ আপনি ভেগে যান।

ঃ তা হয় না ইসমাইল, হতে পারে না।

ঃ পারে। আমার থেকে আপনার বেঁচে থাকা অনেক প্রয়োজন সাইয়্যেদ। লিবিয়ার নিপীড়িত মানুষ আপনার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

ঃ না ইসমাঈল। তোমাকে মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে আমি যেতে পারি না।

ঃ অনুগ্রহ করে কথা বাড়াবেন না। ওরা এসে পড়লো বলে। আপনি চলে যান।

ঃ না, ইসমাইল।

ইসমাইল দেখলো এভাবে কাজ হবে না। সে মুখে বিশেষ ভঙ্গিমায় এক শব্দ করে ঘোড়ার পিছনে জোরে একটি থাপ্পড় দিলো। সংকেত পেয়ে ঘোড়া তীব্রগতিতে ছুটে চললো। ওমর মুখতার কোন কথা বলার সুযোগ পেলেন না। ইসমাইল চারিদিকে তাকিয়ে দূরে একটি বালুর গর্ত দেখে সেদিকে পা বাড়াল। অল্পক্ষণের মধ্যেই জারাজায়ানী বাহিনী বালুর ঢিবি অতিক্রম করলো। কিন্তু ওমর মুখতারকে কোথাও খুঁজে পেল না। তবে তারা আলি জাওয়াদ-এর মৃতদেহ খুঁজে পেল। আলি জাওয়াদ অত্যন্ত সাহসী এক মুজাহীদ। তিনি সর্বদা ওমর মুখতারের সাথে অবস্থান করতেন। কিছুক্ষণের মধ্যে জেনারেল জারাজায়ানী এলেন।

ঃ মেজর!

ঃ স্যার।

ঃ ওমরকে পাওয়া গেছে?

ঃ না স্যার। তবে তার ঘোড়া পড়ে আছে।

ঃ তাহলে নিশ্চয় ওমর কোথাও আত্মগোপন করে আছে। ঘোড়া ছাড়া এই ধূসর তপ্ত মরুতে পালাবার কোন পথ নাই। যাও প্রতিটি বালুকণা তন্ন তন্ন করে খুঁজ। ওমর মুখতারকে খুঁজার জন্য সৈনিকেরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। জারাজায়ানির তীক্ষ্ম দৃষ্টিও চারিদিকে ফিরতে লাগলো। হঠাৎ তার দৃষ্টি একস্থানে থেমে গেল।

ঃ মেজর!

ঃ স্যার।

ঃ কী করছো?

ঃ ওমরের ঘোড়াটাকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি?

ঘোড়ার মাথা লক্ষ্য করে দুটি গুলি ছুঁড়লো মেজর।

ঃ মেজর!

ঃ স্যার।

ঃ ওইটি কি, দেখেছ?

ঃ কোন্‌টি স্যার?

ঃ ঐ যে, আমার কাছে আন।

ঃ স্যার ওটিতো চশমা।

ঃ হ্যাঁ, ওমর মুখতারের চশমা।

চশমাটি হাতে নিলেন জারাজায়ানী। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন–

"আজ ওমর মুখতারের চশমা

পেয়েছি। কাল তার মাথা পাব।"

ক'জন সৈন্য ইসমাইলকে পিটাতে পিটাতে জেনারেলের সামনে হাজির করলো। মারের চোটে তার শরীর দিয়ে রক্ত ঝরছে। চোখের কোনা কাল হয়ে গেছে।

ঃ স্যার।

ঃ কে এ?

ঃ মুজাহীদ।

ঃ মুজাহীদ! এতো দুধের বাচ্চা। এতোটুকু বাচ্চাকে মেরেছ কেন?

ঃ স্যার ওমরকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে সে।

ঃ স্ট্রেন্‌জ !! এতোটুকু বাচ্চা!

ঃ আমাদের উপর গুলি ছুঁড়েছে সে!

ঃ গুলি ছুঁড়েছে!!

ঃ ক্যাপটেন নাতালীসহ দুজন জোয়ান নিহত হয়েছে।

ঃ হোয়াট!! চিৎকার দিলেন জারাজায়ানী। তারপর ফুটবলের মত জোরে একটি কিক দিলেন। ইসমাইল পনের হাত দূরে গিয়ে পড়লো। শরীর কুকড়ে গেছে তার।

ঃ ওকে খতম করে দিই স্যার?

ঃ না। এতো সহজে ওকে মারলে চলবে না। মেজর জাদানী!

ঃ স্যার।

ঃ একে শায়েস্তা করার ভার তোমার উপর দেওয়া হল।

ঃ ওকে স্যার।

ঃ ওর শরীর থেকে চামড়া খুলে নিয়ে তাতে নূনের ছিটা দিবে।

ঃ ওকে স্যার।

ঃ ওমরকে পালিয়ে যাওয়ার সাধ ওকে একটু একটু করে ভক্ষণ করাবে।

ঃ তাই হবে স্যার। ওঠ হারামজাদা।

মেজর জাদানী ইসমাইলকে একটি কিক দিয়ে কান ধরে টেনে তুলল। তারপর সজোরে এক চপেটাঘাত করলো। ইসমাইল জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

ওমর মুখতার বিশ্রাম ও চিকিৎসার জন্য দলবল নিয়ে জাগবুব-এর দিকে রওনা হলেন। সংগে খাদ্যদ্রব্য যেমন নাই, তেমন নাই গোলা-বারুদও। লোকবলও কমে গেছে। আরো মুজাহীদ সংগ্রহ করতে হবে।

সন্ধ্যা প্রায় সমাগত। দ্বীপ্ত সূর্য নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। লাল আভা ধারণ করে সে তখন অস্ত যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ওইতো সামনে জাগবুব। কিন্তু ওকি! কুন্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া কেঁপে কেঁপে উপর দিকে উঠছে কেন? তবে কী নিরীহ গ্রামবাসীদেরকে ওরা শেষ করে ফেলেছে!

মোটামুটি সামর্থ ও উঠতি বয়সী কিশোরদেরকে এক লাইনে দাঁড় করান হয়েছে। সংখ্যায় মোট চল্লিশ-পঞ্চাশ জন হবে। মেজর জাদানীর ঠোঁটে কুটিল হাসি।

পিস্তল হাতে করে তিনি লাইনের এদিক থেকে সেদিকে দুবার পায়চারী করলেন।

ঃ তোমরাই তা হলে ওমর মুখতারের আশ্রয়দাতা। মরতে মরতে সে আজ আমার হাত থেকে বেঁচে গেছে। কিন্তু তোমরা কি করে বাঁচ তাই দেখবো এখন।

ঃ বাঁচা-মরার মালিক আল্লাহ। ক্ষীণকায় ষাটউর্ধ্ব এক বৃদ্ধ মুখ খুলল।

মেজর জাদানী তার সামনে এসে দাঁড়ালো।

ঃ কেন ওমর মুখতার বাঁচিয়ে রেখেছে না?

ঃ তিনি আমাদের নেতা। আমরা তাকে শ্রদ্ধা করি।

ঃ শুধু শ্রদ্ধা! আহার দাও। থাকার জায়গা দাও, অস্ত্র কেনার অর্থ দাও। আর নিজেদের তাজা সন্তানগুলো তার হাতে তুলে দাও। তাই না?

বৃদ্ধ নিশ্চুপ এবার। অদূরে মেশিনগান হাতে এক সৈনিক বসে আছে। নির্দেশের অপেক্ষা করছে সে।

ঃ ক্যাপটেন রোমারী।

ঃ স্যার।

ঃ ঘরের প্রতিটি মানুষকে বন্দী কর।

ঃ ওকে স্যার।

ঃ ছাগল, ভেড়া, উট ও মহিষগুলোকেও বাদ রাখবে না।

ঃ ওকে স্যার।

ঃ গরু-ছাগলের সাথে ওদেরকেও একই নিয়মে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। গাড়িতে উঠানোর দরকার নাই।

ঃ তাই হবে স্যার।

ঃ যাও, প্রতি ঘরে ঘরে আগুন জ্বেলে দাও। আর শোন। বিশেষ করে ঐ ঘরটিতে! ওমর মুখতারের সাধের স্কুল ওটি। অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো মেজর জাদানী।

কান্নার রোল উঠলো চারিদিকে। দুধের শিশুসহ মা-বোন-ভাইদেরকে টেনে টেনে ঘর থেকে বের করে আনা হচ্ছে। বের করে আনা হচ্ছে ঘরের সকল সম্পদ।

ঃ ক্যাপ্টেন।

ঃ স্যার।

ঃ সকলকে এক জায়গায় করা হয়েছে?

ঃ জি স্যার।

ঃ গুড।

ঃ এবার ঘরে ঘরে আগুন জ্বালাও। চোখের সামনেই ওরা ওদের সম্পদ ও ঘর-বাড়ি পুড়তে দেখুক। দেখার মত দৃশ্য বটে। হো-হো- হো। শব্দ করে হেসে উঠলো মেজর। ক্যাপটেনের নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে সৈন্যরা পেট্রোল ঢেলে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিল। মুহূর্তে হু-হু করে আগুন জ্বলে উঠলো। মহিলারা গলা ছেড়ে কেঁদে উঠলো। শিশুরা ভয়ে মায়েদের বুক জড়িয়ে ধরলো। সব শেষে ওমর মুখতারের স্কুলটিতে আগুন ধরানো হল। শিশুরা তাদের প্রিয় স্কুলে আগুন জ্বলতে দেখে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো। গরু-বাছুরের ভ্যা ভ্যা শব্দ একদিকে, অন্যদিকে শিশু ও মহিলাদের কান্নার রোল। তার সাথে আগুনের দাউ দাউ শব্দ। হঠাৎ যেন সব শব্দ ম্লান হয়ে গেল। থেমে গেল মহিলা ও শিশুদের কান্নার রোল। মেজরের গম্ভীর কণ্ঠ গুম্‌গুম্‌ করে বেজে উঠলো–

ফায়ার-ফায়ার।

মেশিনগান গর্জে উঠলো নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে। পঞ্চাশটি তাজা প্রাণ আমের মঞ্জুরী ঝরার মত পৃথিবীর আলো বাতাস থেকে ঝরে পড়লো। তাদের দেহের তাজা রক্ত বালুর উপর গড়িয়ে পড়ছে। মৃত্যু যন্ত্রণায় কিছুক্ষণ নড়া-চড়া করে এক সময় সব দেহগুলো কাঠের মত পড়ে রইল।

মেজরের নির্দেশে সৈন্যরা মৃতদেহগুলোকে ছুড়ে ছুড়ে খালি ট্রাকে উঠালো। তারপর পৈশাচিক বিজয় (?) উল্লাসে বীরদর্পে (?) ফিরে গেল। পিছনে পড়ে রইল আগুনে জ্বলা শ্মশান জাগবুব।

ওমর মুখতার যখন এসে পৌঁছাল তখন সূর্য প্রায় ডুবে গেছে। পোড়া মাটির গন্ধ নাকে এসে ধাক্কা দিচ্ছে। শ্মশানসম গ্রামে একটি জনপ্রাণী নাই, নাই ছাগল,

গরু, ভেড়া, মোষ। নাই অক্ষত কোন ঘর। মানুষ এতো নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক কিভাবে হয়, তা ভাবতে কষ্ট হল তাঁর। মানুষের মধ্যে পশুত্বভাব থাকে সত্য। কিন্তু তার রূপ যে পশুর থেকেও অনেক নীচে তা কল্পনা করতেও কষ্ট হলো ওমর মুখতারের।

ঃ সবাইকে হয়ত মেরে ফেলেছে সাইয়্যেদ ওমর। এক মুজাহীদ মন্তব্য করলেন। এই দেখুন না কত রক্ত এখানে–

ওমর মুখতার রক্তের নিকট গেলেন। রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। বালুও এতো রক্ত শুষে নিতে পারেনি।

ঃ সম্ভবত বৃদ্ধ ও কিশোরদেরকে মেরেছে। অন্যদেরকে বন্দি করে নিয়ে গেছে।

ঃ আমরা এখন কি করবো?

ঃ কিছুই করার নেই। হতাশার সুর ওমর মুখতারের কণ্ঠে।

তিনি পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন তার প্রিয় স্কুলের দিকে। আগুন তখনো নেভেনি সেখানে। তিনি একটি লাঠি দিয়ে কিছু আগুন ও ছাই সরিয়ে ফেললেন। সেখান থেকে একটি আধপোড়া স্লেট বেরিয়ে এলো। হাত দিয়ে উঠালেন তিনি। ফু দিয়ে ছাই সরিয়ে দিলেন। কচি হাতের লেখা পবিত্র কোরআনের আয়াত দেখা গেল। তিন দিন আগে তিনি ছাত্রদেরকে এই পাঠ শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি মৃদুকণ্ঠে আয়াতগুলো পড়তে লাগলেন–

" তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত
এবং স্থাপন করেছেন মানদণ্ড। যাতে
তোমরা ভারসাম্য লংঘন না কর।
ওজনে ন্যায্য মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত কর এবং
ওজনে কম দিয়ো না।
তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন
সৃষ্ট জীবের জন্য"।

পড়তে পড়তে অকুতোভয় সাহসী এই বীরের দু'চোখ ভিজে এলো। কী সুন্দর কথা। কিন্তু কোথায় সেই মানদণ্ড, কোথায় ন্যায় বিচার। কেন পৃথিবীর মানুষ এতো খারাপ!! কেন! কেন!

## ॥ ১১ ॥

১৯১১ সালে ইতালীরা লিবিয়াতে প্রবেশের পর নিরীহ লিবিয়দের উপর তারা যে অমানুষিক ও পৈশাচিক অত্যাচার করেছে তা যেমন হৃদয়বিদারক, তেমন অশ্রুসিক্ত।

আর এ কারণেই শান্ত; ভদ্র, সাদা-সিধা নিরীহ ওমর মুখতার আমরণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেছেন।

১২ অক্টোবর, ১৯১১ সাল। মানশিয়া এলাকার এক রোদ ঝলমলে সকালের কথা। কবিলার মানুষ নিজেদের কাজ-কর্মে ব্যস্ত। বাচ্চারা মেতে উঠেছে খেলা-ধুলায়। দুপুরের রান্নার জন্য মহিলারা প্রস্তুতি নিচ্ছে। অনেকে খোশ গল্পে মেতে উঠেছে। হাস্য কৌতুকে সময় অতিবাহিত করছে অনেকে। হঠাৎ তাদের উপর নেমে এলো এক মহা দুর্যোগ। না- কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়। এটি ইতালী বাহিনীর পৈশাচিক পশুবৃত্তির দুর্যোগ।

মোটর যানের শব্দ শুনে কবিলার অনেক মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। অনেকে মোটর যান দেখেনি। মহিলারাও পর্দার আড়াল থেকে উঁকি দিতে লাগলো। গাড়ি ভরা সৈন্য। তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র।

শিশু ও কিশোরদের চোখে দুনিয়ার বিস্ময়! তারা বলতে গেলে সৈন্যদেরকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ওদের হাতে ওগুলো কী? কী করতে এসেছে!! কিন্তু তাদের সে বিস্ময় ক্ষণিকের জন্য স্থির রইল। হঠাৎ সৈনিকদের হাতের মেশিনগুলো নির্দয় শব্দ করে গর্জে উঠলো। একের পর এক শিশু,কিশোর,বৃদ্ধ ও মহিলারা মাটিতে পড়ে গেল। পালানোর চেষ্টা করলো যে, সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। কবিলার খুব কম লোকই সেদিন তাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিল। আনন্দ মুখর কবিলার বাতাস অল্পক্ষণে আঁশটে রক্তের গন্ধে ভারী হয়ে উঠলো। সাদা বালুর ভূমি রক্তের প্রলেপে লাল হয়ে উঠলো। প্রায় ছয় হাজার প্রাণ পৃথিবীর বৃন্ত থেকে ঝরে পড়লো। যে কয়জন বেঁচে গেল তাদেরকে বন্দি করা হল। কচি ও সুঠাম দেহের অধিকারী মহিলাদেরকে মৃতলাশের পাশে ফেলে ধর্ষণ করা হল।

সে দিন হয়ত পশুবৃত্তি মানুষের মনুষ্যত্ব বৃত্তির (?) কাছে হার মেনেছিল।

একই মাসের ২৬ তারিখে ত্রিপলীর রোম ব্যাংকের পিছনের মহল্লায় চালানো হয়েছিল আর এক অমানুষিক হত্যাযজ্ঞ। মহল্লাবাসীকে ঘর থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে এনে লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হয়েছিল। সব শেষে আগুন জ্বালিয়ে মহল্লাটিকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছিল।

পর দিনের ঘটনা। শিশু,বৃদ্ধ, যুবক ও মহিলা সহ প্রায় পঞ্চাশ জনের একটি দল। ত্রিপলীর ফারসান সেনানীবাসের ফায়ার স্কোয়াডে তাদের দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের ফাঁসি দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফাঁসি কার্যকর হবে গুলির সাহায্যে। তারা জানেনা তাদের কি অপরাধ। কোন অপরাধের জন্য তাদের ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে তা তারা বুঝতেও পারলো না। সম্ভবতঃ তাদের অপরাধ তারা লিবিয়ার মুসলমান অধিবাসী। কিন্তু এই দুধের শিশুগুলো কী অপরাধ করেছে। কী অপরাধ করেছে কিশোর ও চলনে অক্ষম বৃদ্ধ ও মহিলারা। তিন বছরের সব্হীকে তার মায়ের পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। সে বুঝতে পারছেনা কেন তাদেরকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। ওরা খেতে দিচ্ছে না। ওর তো ক্ষিধে পেয়েছে।

ঃ মা- আমার ক্ষিধে পেয়েছে। আমি কিছু খাব। নিরুত্তর মা।

ঃ মা– মাগো। খেতে দাও।

মা নির্বাক, নিরুত্তর। অবিরাম অশ্রু ঝরছে তার চোখ দিয়ে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সে। সারারাত ধরে পশুগুলো তার উপর পাশবিক অত্যাচার করেছে। এখন দাঁড় করিয়ে রেখেছে ফাঁসির মঞ্চে। একটু পরেই সাঙ্গ হবে ভবের লীলা। হায় আল্লাহ!! তুমি মানুষকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি রূপে সৃষ্টি করেছ। মানুষের বিবেক ও বুদ্ধি দিয়েছ! কিন্তু পশুকে তা দাওনি। অথচ সেই মানুষের একি প্রবৃত্তি!! পশু প্রবৃত্তি যে লজ্জায় মুখ লুকাচ্ছে তাদের কার্যকলাপ দেখে!!

এক টুকরা রুটি ও একটি আপেল নিয়ে এক সৈনিক সব্হীর দিকে এগিয়ে এলো। সব্হী মায়ের পানে তাকাল। নীরব অনুমতি চাইছে। কিন্তু একি মা কাঁদছে কেন? অঝোরে পানি পড়ছে কেন তার চোখ হতে!

ঃ মা-মাগো।

ডাকলো সবহী।

নিরুত্তর মা। চোখ মেলে ছেলের দিকে তাকালেন না মা। সৈন্যটি সবহীকে সরিয়ে নিল। হঠাৎ তার কানে একটি কর্কশ চিৎকার ভেসে এলো। ফা-য়া-র।

গর্জে উঠলো মেশিনগান। পিছন ফিরে চাইল সবহী। তার মায়ের দেহ মাটিতে পড়ে আছে। রক্তে ভেসে গেছে গায়ের পোশাক। সবহীর হাতে আপেল। একটি কামড় দিয়েছে তাতে।

ঃ মা– মা–। ছুটে গেল সব্হী। মায়ের গলা জড়িয়ে ধরলো। মাগো, কী হয়েছে তোমার? এমন করছ কেন তুমি? মা-মা কথা বলছনা কেন?

মা অতি কষ্টে ছেলেকে কাছে টানলেন। রক্তাক্ত হাত তার মুখে বুলানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু তা আর হলো না। আর এক ঝাঁক গুলি এসে সব্হী ও মায়ের দেহ ঝাঁঝরা করে দিল।

পরবর্তী বছর অধিকৃত এলাকা গুলোতে বিনা অপরাধে অসংখ্য লোককে হত্যা করল ইতালীরা। যারা বেঁচে গেল তাদের ছায়াহীন মরুর জেলখানায় আটকে রাখা হলো। মহিলাদের ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের পশুবৃত্তি নিবৃত্ত করতে থাকলো। অনেক মহিলা গর্ভবতী হয়ে পড়লো। জন্ম দিল ইতালী ঔরসের অবৈধ সন্তান। অথচ কিছুই তাদের করার রইল না।

হত্যা, ধর্ষণ, আগুন ও লুট করেই ইতালীর বর্বর বাহিনী ক্ষান্ত রইল না। তারা সরাসরি মুসলমানদের আকিদা বিশ্বাসে হাত দিতে শুরু করলো। কোন কারণ ছাড়াই ফাতেহ নামক স্থানে অবস্থিত 'সিদি আজিজ' মসজিদ ধ্বংস করে দিল। হজ্জ আদায়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করল মাদরাসাগুলো বন্ধ করে দিল। সৈন্যরা মসজিদে তাদের আস্তানা গাড়লো মসজিদে গিয়ে তাদের সালাত আদায় বন্ধ হলো। সব থেকে দুঃখজনক ঘটনা ঘটালো এক সেনা অফিসার। সে হাজার হাজার গ্রামবাসীকে সমবেত করল। তারপর পবিত্র কোরআন হাতে নিয়ে তা

মাটিতে নিক্ষেপ করলো। এরপর দুই পায়ে ধান মাড়ানোর মত মাড়াতে লাগলো। অনেকে এই দৃশ্য দেখে চোখ বুজলো। অনেকের বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে এলো। দুহাত উপরে উঠিয়ে কেউ আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলো। কিছুই করার নাই তাদের। চারিদিকে মেশিনগান হাতে সৈন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটু নড়া-চড়া করলেই তার শরীর ঝাঁঝরা করে দেওয়া হবে। মনের আনন্দে তৃপ্তি সহকারে পবিত্র কোরআনকে পায়ে মাড়িয়ে সেনা অফিসার বলতে শুরু করলেন-

"শোন মুসলমানেরা তোমরা কোনদিন মানুষ হতে পারবেনা-যতদিন এই বই তোমাদের কাছে থাকবে, বুঝেছ। তাই তোমাদের মানুষ করার জন্য এ বই আর রাখা হবে না। সৈন্যরা এই বই ঘোড়ার পায়ের নিচে দাও এবং চুলায় খড়ি হিসাবে ব্যবহার কর।" চৌদ্দ বছরের এক সতেজ যুবক নাবিল হামিদ। রাজপুত্রের মত চেহারা। সুঠাম দেহ। খাড়া নাক। সে উঠে দাঁড়াল। অনেক্ষণ ধরে সে ধৈর্য ধরে ছিল। ধৈর্যের বাধ এবার টুটে গেল।

ঃ ওরে অসভ্য বর্বর। তুই কি বুঝবি এই কেতাবের মর্ম। তুইতো পশুরও অধম।

ঃ খামুশ!- চিৎকার ছাড়লো সেনা অফিসার। এখনো ওর দেহে প্রাণ রয়েছে কেন?

ঃ ওরে মৃত....। কথা শেষ হলো না নাবিল হামিদের। মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ারে তার বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেল। অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো সেনা অফিসার। মুসলমানদের ধর্মীয় আকিদা বিশ্বাস বিনষ্ট করার জন্য তারা আরো অভিনব পন্থা অবলম্বন করলো। যে স্কুলগুলো চালু থাকলো তাতে কৌশলে ক্যাথলিক ধর্ম পাঠের ব্যবস্থা করলো। ধর্মীয় সভা সমিতি, আলোচনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো। জোর করে মুসলমান মেয়েদের বিবাহ করে তাদেরকে এবং তাদের গর্ভের সন্তানদেরকে খ্রিস্টান বানানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলো। আরবী শিক্ষা বন্ধ করলো। মসজিদের ইমামদেরকে বাধ্য করলো ইতালীর বাদশার নামের খুৎবা পাঠে। অতঃপর জুমার সালাত আদায় বন্ধ করে দিলো। মার্শাল বাদিলিউ লিবিয়ার মুসলমানদের হজ্জ আদায় বন্ধ করে দিল। এজন্য সে হজ্জ ইচ্ছুক মুসলমানদের ধরে এনে অমানুষিক নির্যাতন করলো।

১৯২৯ সালের কথা। জেনারেল জারাজায়ানী তখন ক্ষমতায়। তিনি একদিন সানুসিয়ার সকল ইমাম, মুয়াজ্জিন, ফিক্হবিদ এবং মসজিদের খাদেমদেরকে একত্রিত করলেন। অতঃপর বানিনা নামক স্থানের একটি ছাদহীন ঘরে বন্দি করে রাখলেন। সারাদিন উত্তপ্ত সূর্যের তাপে তাদের জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠলো। দিন শেষে এক টুকরো শুষ্ক রুটি এবং এক ঢোক পানি দেওয়া হতে লাগলো তাদের। অনাহারে অসুখে তারা অল্প দিনেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এরপর তাদের ইতালীর জেলখানায় স্থানান্তরিত করা হল। সেখানে দীর্ঘ দিন রাখার পর পুনরায় তাদের

বানিনের সেই ছাদহীন ঘরে এনে রাখা হলো। এর মধ্যে তাদের অনেকেই অনাহারে ও রোগে মারা গেলেন।

এর পরও যখন ইতালীরা মুসলমানদের উপর প্রভৃত্ব বিস্তারে সক্ষম হলো না, তখন তারা অন্য পন্থা অবলম্বন করলো। তারা আরবী ভাষা শিক্ষা ও ব্যবহার পুরাপুরি বন্ধ করে দিল। তার বদলে ইতালীয় স্কুল প্রতিষ্ঠা করলো। ভয় দেখিয়ে কখনো, কখনো জোর করে মুসলমান বাচ্চাদের সেই স্কুলে ভর্তি হতে বাধ্য করলো। এজন্য তারা প্রচুর অর্থ ব্যয় ও অমানুষিক পরিশ্রম করলো। তাদের উদ্দেশ্য হলো সমস্ত লিবিয়কে খ্রিস্টান বানানো। তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে গির্জা বানালো। কোন চিঠির উপর আরবীতে ঠিকানা লেখা চিঠি নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে দেওয়া বন্ধ হলো। এমনকি আরবীতে কথাবার্তা বলা পর্যন্ত বন্ধ করার চেষ্টা চালান হল।

১৯২৩ সালের ঘটনা।

জাফ্‌ফারা নামক কবিলাতে হঠাৎ একদিন ইতালী বাহিনী আক্রমণ করলো। কিশোর, যুবক ও সমর্থ পুরুষ মিলে প্রায় হাজার খানেক মানুষকে তারা বন্দী করলো। বড় একটি মাঠে আনা হলো তাদের। মাঠের অন্যপ্রান্তে আনা হলো গ্রামের সকল মহিলা ও শিশুকে। অতঃপর আনা হলো তাদের ঘরের সকল সম্পদ। বালিশ, কাঁথা ও কম্বল পর্যন্তও আনা হলো। এরপর পেট্রোল ঢেলে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। এরপর শুরু হলো মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ার। চোখের সামনে ছোটশিশু তার পিতার মৃত্যু দেখলো। স্ত্রী দেখলো তার স্বামীর মৃত্যু। মা হারাল তার প্রিয় সন্তানকে। এতো বিপদেও তারা কাঁদতে পারল না। যে কাঁদার চেষ্টা করলো তার মাথায় রাইফেলের বাঁট পড়লো।

আগুন তখনো নেভেনি। মৃতদেহ হতে অনেকের প্রাণ বায়ূ তখনো বেরিয়ে যায়নি। মৃত্যু যন্ত্রণায় তাদের শরীর নড়া-চড়া করছে। এমন সময় শুরু হলো ইতিহাসের কলঙ্কময় বর্বর ইতালীয় খ্রিস্টানদের এক প্রহসন। দশ জন মহিলাকে তারা ধরে আনলো। তাদের কি অপরাধ তারা তা জানেনা। হয়ত মুসলমান হওয়াটাই তাদের অপরাধ। নয়ত ওমর মুখতারকে সহযোগিতা করা। কিন্তু সে অপরাধতো সকলের। এই দশজন মহিলার কেন?

ইতালী হায়েনাগুলো জোর করে এই দশজন মহিলাকে বিবস্ত্র করলো। তাদের সবিনয় কাকুতি, প্রাণফাটা আর্তনাদ তাদের মনে কিঞ্চিত দয়ার সঞ্চার করলো না। হিন্দুদের হোলি খেলার ন্যায় তারা পূতপবিত্র ধর্মপ্রাণ মহিলাদের বিবস্ত্র করার খেলায় মেতে উঠলো। এরপর তাদেরকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হলো। সকলের সামনে এক এক করে তাদেরকে ফাঁসি দেওয়া হলো। ফাঁসি দিয়েই ক্ষান্ত হলো না-বর্বর ইতালীরা। বিবস্ত্র গলায় ফাঁস লাগানো ওই দশজন মহিলাকে তারা এক সপ্তাহ জনসম্মুখে টাঙিয়ে রাখলো।

১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসের এক সন্ধ্যা বেলা–

তিনজন সামরিক অফিসারের মনে ফুর্তি করার বাসনা জন্মাল। সৈন্যদের নির্দেশ দিলো "সুন্দরী কচি মেয়ে ধরে আন।" সৈন্যরা বীর দর্পে (?) বেরিয়ে পড়লো মেয়ে খুঁজতে। ঘরে ঘরে তল্লাসী চালিয়ে তারা তিনটি মেয়েকে উঠিয়ে আনলো। পিতা-মাতার বাধা তারা মানলোনা। বুটের আঘাত ও রাইফেলের বাঁটের বাড়ি খেয়ে সিহামের পিতা প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়লো। সিহাম তার পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। বয়স আঠার পেরিয়ে গেছে। বিয়ের কথাবার্তা প্রায় পাকাপাকি। কাঁচা রোদের মত গায়ের রং। পানিভরা গ্লাসের ন্যায় ভরাট যৌবন। অত্যন্ত সুন্দরী সিহাম।

ঃ আব্বু  তোমার কি হলো! সৈন্যদের হাতে কামড় দিয়ে ছুটে এলো সিহাম। সিহামের মা ঘরে নাই। বাপের বাড়ি বেড়াতে গেছে।

ঃ খুব বজ্জাত মেয়ে দেখছি। এক সৈন্য মন্তব্য করলো।

ঃ বজ্জাত হলেও সুন্দরী আছে। অফিসার খুব খুশি হবেন।

ঃ ধর ওকে। অফিসারের কাজ শেষ হলে ফিরিয়ে দেবার পথে আমরাও একটু মজা করবো, ওকে নিয়ে।

ঃ ঠিক বলেছ। ধর।

সিহামকে শক্ত করে ধরে ওরা তার পিতার বুক থেকে ছিনিয়ে নিলো। পিতা উঠে বসার চেষ্টা করলো। পারলো না। মাথা বনবন করে ঘুরছে। চোখেও কেমন ঝাপসা দেখছে।

ঃ মা- সিহাম-

ঃ আব্বু। আমাকে ওরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আব্বু।

ঃ মা- সিহাম। আমি যে চোখে দেখতে পারছিনা। আমাকে ক্ষমা করে দিস মা–।

সিহাম, লতিফা ও নাবিলা এই তিনটি মেয়েকে ওরা উঠিয়ে নিয়ে গেল। সিহাম পথ থেকে কৌশলে ওদের হাত থেকে ভেগে এলো। তারপর পিতাকে নিয়ে কবিলা ছেড়ে ঐ রাতেই অন্যত্র চলে গেল। কিন্তু লতিফা ও নাবিলা! ওদের কপালে কী জুটলো? রাতভর তিন সেনা অফিসার ওদের সারা দেহের উপর পশুত্বের পেচানিক চিহ্ন এঁকে দিল।

একই মাসের আর একটি ঘটনা। তাকনাস এলাকার ফামি সিটি সামরিক ছাউনি। ছাউনির অদূরে কাটা তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে সামরিক জেলখানা তৈরি করা হয়েছে। সেখানে রাখা হয়েছে অসংখ্য নারী, পুরুষ ও শিশুকে। সেই জেলখানার খোলা মাঠে এক মজার (?) খেলায় মেতে উঠলো ইতালীর অসভ্য পশুগুলো।

জাবালে আখদার-এর জারদাউমূল আবিদ হতে তারা কজন মুজাহীদকে বন্দি করে আনলো ইতোপূর্বে ওই কবিলার অনেক মানুষকে ধরে এনে এখানে রাখা হয়েছে। বয়োবৃদ্ধ মুজাহীদ শেখ মিফতাহুল উবাইদি-এর সামনে এলেন

দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনা অফিসার। উবাইদিকে হাত-পা বেঁধে মাটিতে ফেলে রাখা হয়েছে।

ঃ কেমন লাগছে উবাইদি?- পা দিয়ে লাথি মেরে তাঁকে উল্টে দিয়ে জানতে চাইলেন অফিসার। মিফতা উবাইদি তার দিকে একবার তাকালেন। মারের চোটে তাঁর শরীর দিয়ে রক্ত ঝরছে। কোন উত্তর দিলেন না।

ঃ হ্যাঁ, বলো, কেমন মজা লাগছে?

ঃ তোমাদের মত পশুদের সাথে কথা বলতে আমার ঘৃণা হয়।

ঃ তাই নাকি?

নিরুত্তর উবাইদি। মুখ অন্য দিকে ফেরালেন তিনি। সমস্ত জেলবাসীকে একত্রিত করা হয়েছে। তার দিকে চেয়ে আছে সকলে। অশ্রুসিক্ত করুণ চাহনী। উবাইদির পরিচিত অনেকে। তারা নীরবে কাঁদছে। অনাহার ক্লিষ্ট পাংশুর মুখ। উবাইদি বুঝতে পারছে- ওকে নিয়ে সকলের সামনে ইতালীর হায়েনারা কোন নৃশংস ঘটনার অবতারণা করতে যাচ্ছে। রাইফেল হাতে অসংখ্য সৈন্য দাঁড়ান চারিদিকে। জেলবাসীদের পাহারা দিচ্ছে তারা। কেউ একটু নড়া-চড়া করলে তাদের মাথায় রাইফেলের বাঁটের আঘাত পড়ছে।

মিফতাহ উবাইদির চাচাত ভাই ছলেহ আলী। তিনিও ধরা পড়েছেন উবাইদির সাথে। হাত পা বাঁধা অবস্থায় তাঁকেও আনা হলো। দু ভাইকে পাশা-পাশি কিছুক্ষণ ফেলে রাখা হলো। ক'জন সৈন্য এসে তাঁদের হাত পায়ের বাঁধনের দড়ির সাথে লম্বা শক্ত মজবুত মোটা দড়ি বাঁধলো। তারপর দড়ির দুই প্রান্ত দুটি জীপ গাড়ির পিছনে বেঁধে দেওয়া হলো। ছলেহ আলী ও উবাইদি বুঝতে পারলো তাদের জীবনের খেলা এখনি সাঙ্গ হবে। কিন্তু তা করার জন্য তো অনেক সহজ উপায় আছে। এতো নিষ্ঠুর পৈশাচিক উপায়ে করা কেন। দুই ভাই একবার চোখাচোখি হয়ে তাওবা পড়ে নিল। তারপর মৃদুস্বরে কালিমা তায়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তে লাগলো। হঠাৎ অফিসারের নিষ্ঠুর কণ্ঠ গুম গুম করে বেজে উঠলো।

ঃ শুরু করো।

দুটি জীপ একই সাথে বিপরীত দিকে চলতে শুরু করলো। কয়েক হাজার অসহায় নর-নারী ও শিশু নীরবে সেদিকে চেয়ে রইল। অনেক শিশু ভয়ে চোখ ঢাকলো। অনেকে শব্দ করে কেঁদে উঠলো কিন্তু তাদের সে কান্নার শব্দ অফিসারের অট্টহাসির শব্দে চাপা পড়লো।

জীপদুটি আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে। শেখ উবাইদি ও ছলেহ আলী চোখ বুজে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। আর একটু, আর একটু পরেই সাঙ্গ হবে সব। জমে থাকা দড়ি ক্রমেই শেষ হয়ে আসছে। এক সময় দুদিক থেকে টান পড়লো। দুভাই কষ্ট ও যন্ত্রণায় চিৎকার দিয়ে উঠলো। কিন্তু কএক সেকেন্ড মাত্র। তারপর তাদের শরীর ছিঁড়ে দুখন্ড হয়ে গেল। শহীদের তাজা রক্ত চুষে মরুর বালু ধন্য হলো।

## ॥ ১২ ॥

মার্শাল বাদিলিউ-এর পর জেনারেল জারাজায়ানীর উপর নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পিত হয়। জারাযাজানী অত্যাচারের পর অত্যাচার করে মুজাহীদ ও সাধারণ মানুষদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলেন। বাইরের জগত ও মানুষ জন থেকে ওমর মুখতারকে বিচ্ছিন্ন করে দেন তিনি। নিরাপরাধ অসহায় গ্রামবাসীদের ধরে এনে তারকাটার বেড়া দিয়ে ঘেরা মরু-জেলখানায় বন্দি করে রাখেন। অর্ধাহারে, অনাহ-ারে রেখে তাদের উপর ইতিহাসের নৃশংসতম অত্যাচার করতে থাকেন দিনের পর দিন।

মুজাহীদদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার অজুহাত দেখিয়ে জারাযায়ানী আশি হাজার মানুষকে মরু জেলখানায় বন্দী রাখেন। এর অধিকাংশই শিশু, নারী ও বৃদ্ধ। এদেরকে শুধু বন্দী করেই ক্ষ্যান্ত হননি। তাদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে সমস্ত মাল-সম্পদ লুট করে নেন। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে মরু জেলে আটক থাকা ৯০% শিশু মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিল। অধিকাংশ মানুষ চোখের অসুখে ভুগে ভুগে দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। কোন মুজাহীদ বন্দী হলে তাকেও তারা এই মরু জেলে আটকে রাখতো। কবিলার নেতা গোছের বা ছোটখাট মুজাহীদ নেতা বন্দী হলে তাদের পাঠানো হতো বিশেষ বন্দিখানায়। সেখানে চলতো তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার।

মাঝে মধ্যে মরুজেলে এসে কোন কোন সেনা অফিসার লাঞ্ছনা ও অপমান করার সুরে বলত

"তোমাদের বেদুঈন নবী তোমাদের
রক্ষা করার জন্য আসবে, যে
তোমাদের জেহাদ করার জন্য
উৎসাহিত করেছে। সে এসে
আমাদের হাত থেকে তোমায়
রক্ষা করে নিয়ে যাবে!!!"

কিন্তু এতো অত্যাচার, জীবনের ঝুঁকি–তার পরও বন্দি জেলের অভ্যন্তর হতে মুজাহীদদের সাহায্য করার কাজ গোপনে চলতে লাগলো। বন্দী হয়ে আসার সময় মিয়াদী হান্নাবী ও আবদুল্লাহর মায়ের কাছে দু'ব্যাগ বিস্ফোরক ছিল। কৌশলে তারা সে ব্যাগ মুজাহীদদের নিকট পৌছানোর পরিকল্পনা করলো। হান্নাবী অন্য একজন মহিলা ও আব্দুল্লাহর মা ছোট একটি তাঁবুতে একই সাথে অবস্থান করে।

ঃ কি করে এগুলো পাঠান যায় হান্নাবী?

ঃ আমার স্বামীর সাথে কথা হয়েছে কাল রাতে।

গভীর রাতে কাটা তারের বেড়ার ওপাশে এসেছিলেন তিনি।

ঃ আমাকে তো বল নাই।

ঃ সময় পেলাম কোথায়!

ঃ তারপর?

ঃ মুজাহীদদের খুবই দুরবস্থা এখন। তাদের খাদ্য, অস্ত্র প্রায় নিঃশেষ!

ঃ হায় আল্লাহ!

ঃ ওমর মুখতারও ভাল নেই।

ঃ কেন?

ঃ ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে কোমরে ব্যথা পেয়েছেন।

ঃ আল্লাহ তুমি তাকে সুস্থ করে দাও।

ঃ বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগের সমস্ত পথ ওরা বন্ধ করে দিয়েছে।

ঃ তার মানে মুজাহীদরা এখন এক প্রকার বন্দী?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ তা হলে উপায়?

ঃ তাতো জানি না। মনে হচ্ছে তাদের পরাজয় আসন্ন।

ঃ হায় খোদা! তুমি এ কি বলছ হান্নাবী!

ঃ শোন বোন,।

ঃ বল।

ঃ আমরা কিছু খাদ্য সংগ্রহ করি। আজ রাতেও ও আসবে। সাথে ক'জন মুজাহীদ থাকবে। আমরা সেই বিস্ফোরক ও খাদ্য তাদের হাতে পৌছে দেব।

ঃ ঠিক আছে। কখন আসবে?

ঃ রাত দ্বি-প্রহরের পর। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ যখন পুব আকাশে উদিত হবে।

ঃ ঠিক আছে। তা হলে চলো এখন কিছু শুষ্ক খাবার সংগ্রহ করি।

ঃ চল। বোন তুমি একটু দেখ আব্দুল্লাহকে। ও ঘুমাচ্ছে। জ্বরটা মোটেও ছাড়ছে না।

ঃ আমি ওর মাথায় পানি পট্টি দিচ্ছি। তোমরা চিন্তা করো না।

এ মহিলার নাম শাতিলা ছিদ্দিক। তার স্বামীও মুজাহীদ। বিবাহিত জীবন দশ বছর। কোন বাচ্চা-কাচ্চা নাই। দুটি বাচ্চা হয়েছিল। একটি ভূমিষ্টের সময় অন্যটি ভূমিষ্টের এক মাস পরে মারা যায়। দেখতে বেশ সুন্দরী। অটুট আকর্ষণীয় স্বাস্থ্য।

আবদুল্লাহর মা ও হান্নাবী তাঁবু হতে বের হবার প্রস্তুতি নিল। এমন সময় দু'জন সৈনিক এসে ওদের তাঁবুর সামনে দাঁড়াল।

তারপর দু'জন দু'দিক থেকে তাঁবুকে একবার প্রদক্ষিণ করলো। হান্নাবী তাড়াতাড়ি বিস্ফোরকের ব্যাগ ও সংগৃহীত খাদ্য লুকিয়ে রাখলো। তাঁবুর প্রবেশ

পথের কাপড় সরিয়ে একজন সৈনিক ভিতরে মুখ ঢুকাল। লোলুপ দৃষ্টিতে তিন জন মহিলার দিকে তাকাল সে। তারপর ভেতরে প্রবেশ করলো। তার পিছে অন্য জনও। ওরা সোজা এসে শাতিলার হাত ধরলো। বাধা দিল শাতিলা। কিন্তু সে বাধায় কাজ হলো না। জোর করে তাকে বের করে নিয়ে গেল সৈনিকদ্বয়। ইতো পূর্বেও তাকে দুবার নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেনা অফিসারগুলো তাদের পশু প্রবৃত্তিকে নিবৃত করেছে তার পুষ্ট দেহকে কুরে কুরে খেয়ে। লজ্জায়, অপমানে তার প্রথমে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হয়েছে। কিন্তু পারেনি। প্রতিদিনই প্রতি তাঁবু হতে মহিলা ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের দেহকে ভোগ করা হচ্ছে। কেউ জোর করলে বা বাধা দিলে তার কপালে ঘটেছে নির্মম পরিণতি– যেমনটি তার বেলায় ঘটেছে। ওরা তাকে বিবস্ত্র করে খাটিয়ার উপর চিৎ করে শোয়ায়ে শক্ত দড়ি দিয়ে হাত-পা বেঁধে নির্যাতন করেছে। বীভৎস ও নির্মম পশুবৃত্তির এমন রূপ থাকতে পারে শাতিলার তা জানা ছিল না।

ঃ আজও মেয়েটির উপর অত্যাচার চলবে। হান্নাবী মন্তব্য করলো।

ঃ সবার উপরেই তো চলছে অত্যাচার। কাল বা পরশু হয়ত তোমাকে বা আ-মাকে ওদের দেহ ভোগের পাত্র হতে হবে। বয়স বেশি বলেও হয়ত আমাদের রেহাই দেওয়া হবে না।

ঃ এর মধ্যেই তো অনেক মেয়ে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে।

ঃ কী হবে তা হলে?

ঃ কী আর হবে!

ঃ ওরা যে জারজ সন্তান! ওদের স্বামী, সমাজ কী মেনে নিবে?

ঃ তোমার বেলায় যদি এমনটি ঘটে হান্নাবী?

হান্নাবী এবার চুপ রইল। আসলে এ প্রশ্নের তো উত্তর নাই। ওরা সকলেই পরিস্থিতির শিকার।

ঃ শোন হান্নাবী! গর্ভবতী ওই সব মেয়েদেরকে আমরা বীরাঙ্গনা বলে আলিঙ্গন করে নিবো। এ যে কত বড় আত্ম উৎসর্গ ও আত্মদান–তা প্রতিটি মুজাহীদ স্বীকার করবে।

ঃ আচ্ছা বোন, বিদেশী সৈন্য কোন দেশ দখল করলে কী এমন হয়?

ঃ কখনো হয়, কখনো হয় না!

ঃ বুঝলাম না।

ঃ মুসলমানরা কোন দেশে প্রবেশ করলে সে দেশের জনগণের উপর যেমন অত্যাচার হয় না, তেমন সে দেশের মা-বোনদের ইজ্জতও নষ্ট হয় না। মুসলম-ানদের সাথে অন্য ধর্মাবলম্বীদের পার্থক্য এখানেই।

ঃ মা মাগো।

আব্দুল্লাহর দুর্বল করুণ ডাকে ওদের কথা থেমে গেল। ছেলেকে কোলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলো মা। জ্বরে শরীর পুড়ে যাচ্ছে ছেলের। কী হবে এখন। এক ফোঁটা দাওয়া নেই। ভাল একটু খাদ্য নেই। ছেলে আমার বাঁচবে তো!!

ছেলেকে শুইয়ে দিয়ে তার কপালে পানি পট্টি দিতে থাকলেন মা।

সমস্ত মরুর বন্দিশিবির ঘুমে অচেতন। নিস্তব্ধ নীরব চতুর্দিক। কৃষ্ণপক্ষের নিকশ আঁধার মরুকে কুয়াশার মত আচ্ছন্ন করে রেখেছে। দূরের বস্তুকে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

আব্দুল্লাহর মা ও হান্নাবীর চোখে ঘুম নাই উশ-ফিশ করে তাদের সময় কাটছে। তাঁবুর বাইরে এসে তারা মাঝে মধ্যে পূর্ব আকাশের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যাচ্ছে। না, এখনো কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয়িত চাঁদের দেখা মিলছে না। আর কত দেরী?

শাতিলা মড়ার মত ঘুমুচ্ছে। ওর উপর আজ বেশি অত্যাচার চলেছে। শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্ত জমে গেছে হায়েনাদের কামড়ের ফলে। তার কপালে হাত রেখে খুব মৃদু স্বরে হান্নাবী ডাকলো। শাতিলা চোখ মেললো না। উঠে বসার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। সমস্ত শরীরে ব্যথা। বিশেষ করে দেহের নিম্নাঙ্গে। হান্নাবী তাকে উঠে বসতে সাহায্য করলো।

ঃ পুব আকাশে চাঁদ উঠেছে শাতিলা।

ঃ তোমরা এখন যাবে?

ঃ হ্যাঁ, বোন। আমার আবদুল্লাকে একটু দেখ।

ঃ আচ্ছা যাও। চিন্তা করো না। ওর জ্বর কমেছে?

ঃ একটু কমেছে মনে হচ্ছে।

ঃ আমি পানি পট্টি দিব। তোমরা বেরিয়ে যাও।

হান্নাবী ও আব্দুল্লার মা বিস্ফোরকের ব্যাগ দুটো শরীরের কাপড়ের মধ্যে লুক-াল। তারপর খাবারের ব্যাগ নিয়ে তাঁবু হতে বের হবার প্রস্তুতি নিল।

ঃ একটু দাঁড়াও!

ঃ কিছু বলবে।

ঃ হ্যাঁ। দেখ আমার বালিশের নিচে বেশ কিছু অর্থ রয়েছে। আর রয়েছে আমার গহনাগুলো। ওগুলো নিয়ে যাও বোন।

ঃ ওগুলো কেন শাতিলা?

ঃ আমার এই ক্ষুদ্র দানে যদি মুজাহীদদের কিঞ্চিত উপকার হয় নিজের জীবন সার্থক মনে করবো। ওই টাকা দিয়ে তারা কিছু অস্ত্র ও গোলা বারুদ কিনতে পারবে। দাঁড়িয়ে আছ কেন, নাও বোন, নাও।

চোখ ভিজে এলো শাতিলার। হান্নাবীর চোখেও পানি এলো। আবদুল্লাহর মা বালিশের নীচ হতে গহনা ও অর্থগুলো নিয়ে শাতিলাকে একবার ভাল করে দেখে তার কপালে চুমু খেল।

ঃ আমরা আসি বোন।

ঃ সাবধানে যেও।

ঃ আচ্ছা।

ঃ শোন

দাঁড়িয়ে পড়লো ওরা।

ঃ তোমার–অর্থাৎ তোমাদের কিছু হলে আমিই আবদুল্লাহর 'মা' হবো।

ঃ বোন।

ছুটে এলো আবদুল্লাহর মা। ওকে জড়িয়ে ধরলো।

ঃ দেরী হয়ে যাচ্ছে। তোমরা বেরিয়ে যাও। আবেগের সময় নয় এখন। আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করুন। ওরা বেরিয়ে গেল।

***

ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম, হান্নাবী সালাম দিল। কেমন আছ হান্নাবী। সালামের উত্তর নিয়ে জানতে চাইলো হান্নাবীর স্বামী।

ঃ তোমরা কেমন আছ?

হাসলেন মুজাহীদ। তার পর বল্লেন–মুজাহীদরা স-ব সময় ভাল থাকে।

ঃ বিস্ফোরকগুলো নাও।

ঃ দাও।

ঃ রাইফেলের আগা বাড়িয়ে দাও।

ঃ আপনারা এই খাবারগুলো নিন? আব্দুল্লাহর মা অন্য মুজাহীদদের বললেন। আর এই ব্যাগটি নিন। এতে নগদ অর্থ ও সোনার অলংকার আছে। এগুলো দিয়ে অস্ত্র ও গোলাবারুদ কিনবেন।

ঃ ঠিক আছে দিন।

মুজাহীদরা রাইফেলের আগা বাড়িয়ে দিল। কাটা তারের বেড়ার এ পাশ থেকে এরা ছোট ছোট ব্যাগ এক এক করে পার করে দিলো।

ঃ দ্রুত। তাড়া দিল হান্নাবী। গার্ডরা এদিকে আসছে। ভেগে যাও তোমরা। তাড়া-তাড়ি।

ঃ তোমরাও চলে যাও।

ঃ আমাদের চিন্তা করো না। তাড়াতাড়ি ভেগে যাও তোমরা। হঠাৎ এক ঝলক টর্চ লাইটের আলো এসে পড়লো মুজাহীদদের উপর। ওরা দ্রুত ভেগে যাওয়ার সময় একটি ব্যাগ ফেলে গেল। ইতালী সৈন্যরা গুলি ছোড়ার আগেই ওরা অনেকদূর চলে গেল। হান্নাবীরাও দ্রুত নিজেদেরকে লুকিয়ে ফেলতে সক্ষম হলো। সৈন্যরা লম্বা লাঠির সাহায্যে মুজাহীদদের ফেলে যাওয়া ব্যাগ এনে দেখলো তাতে বেশ কিছু নগদ অর্থ।

রাতের আঁধার কেটে পুব আকাশ সাদা হয়ে উঠলো। হান্নাবী ও আবদুল্লাহর মা বাকি রাতটুকু ঘুমাতে পারলো না। কোন মুজাহিদের গায়ে গুলি লাগেনিতো!! ওরা দুজনেই এক সাথে ফজরের নামাজে দাঁড়াল। নামাজ শেষে দুহাত উপরে তুলতেই ওদের দুচোখ ভিজে এলো। ওরা মন ভরে কাঁদলো। মুজাহীদদের কল্যাণ ও সাহায্য কামনা করে দুয়া করলো।

শাতিলা আব্দুল্লাহকে জড়িয়ে ধরে ঘুমুচ্ছে। ওকে ডাকলো আব্দুল্লাহর মা। অলসতা দূর করে উঠে বসলো শাতিলা। জ্বর কমেনি আব্দুল্লাহর। কপালে মায়ের হাতের স্পর্শ পেয়ে চোখ মেলল আব্দুল্লাহ!

ঃ রাতে কোথায় গিয়েছিলে মা!

ঃ কোথায় আবার যাব–পাগল ছেলে।

ওকে কোলে উঠিয়ে নিল। গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। হঠাৎ তাঁবুর সামনে সৈন্যদের বুটের শব্দ শোনা গেল। ওরা তিন জনই সতর্ক হলো। পর্দা সরিয়ে এক অফিসার প্রবেশ করলো। পিছনে ক'জন সৈনিক তবে ইতালীয় নয়। ইথিওপিয় ইথিওপিয় কিছু লোক ইতালীদের সাথে কাজ করছে। এরাও ইতালী সৈন্যদের মত বেতনভোগী। শাতিলা অফিসারের দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টি ছুড়ে দিল। কাল এই শয়তানটিই তাকে কুরে কুরে খেয়েছে। সকাল না হতেই আবার ছুটে এসেছে। অসভ্য বন্য জানোয়ার!!

অফিসার পায়ের আঘাতে শাতিলাকে একদিকে ফেলে দিলো। তারপর হান্নাবীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পিছনে দাঁড়ানো এক ইথিওপিয় চর ছিল তাদের সামনে। অফিসার তার দিকে তাকালো জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল সে। এরপর আব্দুল্লাহর মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ঃ আমার ছেলে খুবই অসুস্থ। ছেলেকে বুকে জোরে জড়িয়ে ধরল মা।

অফিসার চরের দিকে আবার তাকালো। মাথা নেড়ে এবারও সে সম্মতি জানাল।

ঃ নিয়ে এসো এদেরকে। জোয়ানদেরকে নির্দেশ দিলেন অফিসার।

সৈন্যরা হান্নাবী ও আব্দুল্লাহর মাকে জোর করে টেনে হিঁচড়ে তাঁবু থেকে বের করে নিয়ে গেল।

ঃ মা মাগো। আব্দুল্লাহ ক্ষিণ কণ্ঠে কাঁদতে লাগলো। তোমাকে ওরা ওভাবে নিয়ে যাচ্ছে কেন। মা মাগো। আমার যে গায়ে জ্বর। আমার খুব ক্ষিধে পেয়েছে মা। মা মা। মা গো।

শাতিলা আব্দুল্লাহকে বুকে জড়িয়ে ধরলো।

ঃ কাঁদে না বাবা! আমি আছি না। আমিই তোর মা- বাবা। আমিই তোর মা বাবা গলা ধরে এলো শাতিলার।

বিচারের নাম করে প্রহসন হলো মাত্র। ঘুম থেকে উঠেই সকলে শুনলো ঘটনা। সকাল আটটা পয়ত্রিশ মিনিটে আব্দুল্লার মা এবং হান্নাবীর ফাঁসি হবে। হবে বন্দিখানার মধ্য মাঠে। অসংখ্য বন্দিকে জোর করে ফাঁসি মঞ্চের চতুর্দিকে সমবেত করা হল। রাইফেল হাতে তাদেরকে ঘিরে রাখলো প্রায় তিনশত সৈনিক।

হান্নাবী ও আব্দুল্লাহর মাকে ফাঁসির মঞ্চে আনা হলো। শক্ত করে তাদের হাত-পা বাধা। জেনারেল জারাজায়ানীসহ আরো তিনজন অফিসার এলো তাদের পিছনে। জারাজায়ানীর নির্দেশে একজন অফিসার উচ্চস্বরে অভিযোগ বলতে শুরু করলো– (অনুবাদকের মাধ্যমে তা সকল বন্দিদের শুনিয়ে দেওয়া হলো)

ঃ এরা ঘৃণ্য অপরাধী। ওমর মুখতারের লোকদেরকে এরা সাহায্য করেছে। তাদের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। ইতালী সরকারের আইনে তাদের বিচার হলো ফাঁসি এবং সে ফাঁসি হবে সকলের সামনে। যাতে করে তাদের পরিণতি দেখে দ্বিতীয় আর কেউ যেন এ ধরনের কাজ করার সাহস না দেখায়।"

শাতিলা বেশ পিছনে ছিল। তার কোলে আব্দুল্লাহ। খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছে তাকে। ক'দিনের জ্বরে ভীষণ কাহিল হয়ে গেছে। সে বুঝতে পারছে না এতো লোকের সমাগম কেন? হঠাৎ মায়ের দিকে নজর পড়লো তার। মিষ্টি হাসলো মাকে দেখে।

ঃ মা মাগো।

ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকলো আব্দুল্লাহ। শরীরে যেমন শক্তি নেই কণ্ঠেও তেমন জোর নেই। জ্বরেও এক ফোটা ঔষধ পড়েনি পেটে।

শাতিলা ভিড় ভেদ করে একটু একটু করে সামনে আসার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না।

ঃ মায়ের হাত পা বাধা কেন আম্মি (ফুফি)?

উত্তর দিল না শাতিলা।

ঃ মাকে ওরা ওভাবে ধরে নিয়ে যাচ্ছে কেন?

নিরুত্তর শাতিলা। কি উত্তর দিবে সে। অবোধ এই শিশু কি বুঝতে পারছে একটু পরেই তার মায়ের জীবনলীলা শেষ হবে। আর কোন দিন সে তার মাকে ডাকতে পারবে না। মায়ের বুকে মাথা গুজতে পারবে না। গলা জড়িয়ে ধরে মায়ের অধরে চুমা দিতে পারবে না। মা-ও তাকে সোনা মানিক বলে কোলে উঠিয়ে নিয়ে আদরের স্পর্শে জড়িয়ে ধরবে না। তাকে ছেড়ে তার মা চলে যাবে অনেক দূরে।

ঃ ফুফি। মাকে ওরা কাঠের উপর উঠাচ্ছে কেন। হান্নাবী ফুফিকে উঠাচ্ছে কেন?

ঃ চুপ কর বাবা। এবার মুখ খুল্‌ল শাতিলা।

তার চোখ ভিজে উঠেছে।

ঃ আমি মায়ের কাছে যাবো।

ঃ এখন যাওয়া যাবে না বাবা!

ঃ কেন!! মাকে কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দিল কেন? মা মা গো।

কালো কাপড় হাত দিয়ে সরিয়ে ফেললো আব্দুল্লাহর মা। হয়ত ছেলের ক্ষীণ কণ্ঠের মা ডাক তার কানে পৌছে থাকবে। শাতিলা দূর থেকে হাত নাড়ছে। সমবেত জনতাকে একবার দেখলো সে। হঠাৎ তার দৃষ্টি আটকে গেল শাতিলার দিকে। তার কোলে আব্দুল্লাহ "আমার সোনা মানিক আব্দুল্লাহ। হে আল্লাহ তুমি ওকে দেখ। ওর আপন বলতে কেউ রইল না। খোদা, হে দোজাহানের মালিক! এই নর পশুদের অত্যাচারের সাজা তুমি দিয়ো।"

ঃ মা– মা– মাগো।

আব্দুল্লাহর ক্ষীণ কণ্ঠ এবার একটু জোরে বেজে উঠলো। ছেলের পাংশু মুখের দিকে পলকহীন নেত্রে চেয়ে রইল মা। একজন সৈনিক এসে তাকে কাল কাপড় পরিয়ে দিল আবার। তারপর দুজনের গলায় ফাঁসের দড়ি পরিয়ে দেওয়া হলো।

পিন পতন নিস্তব্ধতা চতুর্দিকে। বন্দীদের অনেকের দৃষ্টি ফাঁসির মঞ্চে। অনেক দৃষ্টি অবনত। এদৃশ্য দেখার মত নয়। সব কিছু প্রস্তুত। ঘড়ির দিকে চেয়ে আছেন সেনা অফিসার।

ঃ শেষ নাম জপ কর তোমরা।

লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ

অফিসার হাত নেড়ে সংকেত দিলেন। জল্লাদরূপী সৈনিক দুজনের পায়ের নিচ থেকে কাঠ টেনে নিল। "ফুট" করে শব্দ হল একটি। দুটি তাজা প্রাণ ফাঁসির দড়ি পরে শূন্যে ঝুলে রইল।

সমবেত জনতার কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল

আল্লাহু আকবার

আল্লাহু আকবার

জুলুম নিপাত যাক

ঃ ফুফি–মায়ের কি হলো। মা কি মারা গেছেন? মাকে ওরা মেরে ফেল্ল কেন? আল্লাহু আকবার ধ্বনির মাঝে আব্দুল্লাহর এ কথা কারো কানে পৌছাল না। এমন কি শাতিলাও ভালমত শুনতে পেল না। সেও হাত তুলে চিৎকার দিল–

জুলুম নিপাত যাক।

সত্যের জয় হোক।

অজান্তে আব্দুল্লাহর দুহাত উপরে উঠলো আল্লাহু আকবার, জুলুম নিপাত যাক।

## ॥ ১৩ ॥

লিবিয়াতে সৈন্য পাঠানোর পর থেকে ইতালীয় নেতৃবর্গ বেশ দুশ্চিন্তার মধ্যে সময় অতিবাহিত করতে থাকেন। তারা ধারণা করেছিল উসমানীয়দের সাথে সন্ধির পর সমস্ত লিবিয়া তারা সহজেই দখল করে নিতে পারবে। অশিক্ষিত এই মরুবাসীদের পদানত করতে মোটেও বেগ পেতে হবে না। কিন্তু বাস্তবে এসে

তাদের সে স্বপ্ন আকাশ-কুসুমে রূপ নিল। সামান্য একজন স্কুল মাস্টারের রণকৌশল, বিচক্ষণতা ও একতার কাছে তারা প্রতিটি স্থানে চরম ভাবে মার খেতে থাকলো। হারাতে থাকলো প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত অসংখ্য সৈনিক ও গোলাবারুদ। ভেস্তে যেতে লাগলো তাদের এক একটি পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ। অসংখ্য সৈন্যের সাথে তাদের হারাতে হলো উচ্চ পদস্থ ও নিম্ন পদস্থ অনেক সামরিক অফিসারকেও।

এসব খবর রোমে পৌঁছানোর পর সে দেশের মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হলো। পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দ ও ধর্মীয় নেতাদের মাঝেও তার প্রভাব পড়লো। এ ব্যাপারে আলোচনার জন্য পার্লামেন্টে বিশেষ অধিবেশন ডাকা হলো। অনেক বাক-বিতণ্ডা ও তর্ক-বিতর্কের পর লিবিয়াকে ইতালীয় উপনিবেশে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

ইতালীর নেতা মুসোলিনী সামরিক অফিসারদের সাথে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠক করলেন। তারপর জেনারেল বাদিলিউকে ত্রিপলী ও বারকার শাসক নিযুক্ত করে পাঠালেন। ঠিক ওই সময় বারকা এবং জাবালে আখদার এলাকায় মুখতার বাহিনীর হাতে ইতালী বাহিনী চরমভাবে মার খাচ্ছে।

বাদিলিউ এসে তার ভাণ্ডারে সঞ্চিত সকল রণকৌশল ও অত্যাচারের অপকৌশল প্রয়োগ করে তেমন কোন অগ্রগতি অর্জন করতে পারলো না। বরং একের পর এক পরাজয় বরণ করতে শুরু করলো। তখন তিনি অন্য একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। তিনি লিবিয়া থেকে সৈন্যসংখ্যা কমিয়ে দিলেন। নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা যায় এমন সৈন্য রেখে বাকি সৈন্যদের ইতালীতে পাঠিয়ে দিলেন। এর পর মোটা অংকের অর্থ ব্যয় করে জাবালে আখদার এলাকায় নতুন নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণে মনোনিবেশ করলেন। উদ্দেশ্য হলো সৈন্যদের সহজে চলাচল ও দ্রুত পৌঁছানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। কেননা, তখন পর্যন্ত জাবালে আখদারই ওমর মুখতারের প্রধান ঘাঁটি। তিনি সমস্ত লিবিয়া হতে উৎসর্গীকৃত যুবক, কিশোর ও প্রৌঢ়দেরকে একত্রিত ও সংগঠিত করে সেখানে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছেন আর সুযোগ বুঝে ইতালীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছেন।

অন্যদিকে জেনারেল বাদিলিউ অনেক লিবিয় রাজনৈতিক সাজাপ্রাপ্ত নেতা কর্মীদের মুক্তি দিলেন। সেই সাথে সারা দেশব্যাপী লিফলেট বিলি করার মাধ্যমে মুজাহীদদেরকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানালেন। সেই সাথে কেউ আত্মসমর্পণে অস্বীকার করলে তাদেরকে চরম শাস্তির হুমকিও দিলেন।

জেনারেল বাদিলিউ মুসোলিনির ইঙ্গিতে অন্য আর একটি কূট পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। তা হলো, তিনি ওমর মুখতারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে উভয়ের মাঝের মতবিরোধ দূর করার জন্য আলোচনার প্রস্তাব দিলেন। সেই সাথে এটিও

জানিয়ে দিলেন যে, আমরা সমস্ত শত্রুতা ও মতপার্থক্য ভুলে একত্রে সহাবস্থান করতে আগ্রহী।

আলোচনার প্রস্তাব পাওয়ার পর ওমর মুখতার দশটি শর্তের উপর একমত হওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। শর্ত দশটি হলো ঃ

(এক) এই ঐক্য চুক্তির সাক্ষী হিসাবে তিউনিসিয়া এবং মিসরের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবে। আর চুক্তি পত্রের খেলাপ কোন কাজ হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দল থাকবে।

(দই) ইতালীয় কর্তৃপক্ষ আমাদের ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করবে না। আর দ্বীন প্রচার ও পালনেও কোন প্রকার বাধা দিতে পারবে না।

(তিন) ইতালী কর্তৃপক্ষ হতে আরবী ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

(চার) অফিস আদালতের কর্মচারী-কর্মকর্তা দু'দেশের লোক থেকে সমানভাবে নিতে হবে।

(পাঁচ) বিশেষ কিছু স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যেখানে শুধুমাত্র হাদিস, কুরআন, তাফসীর ও অন্যান্য দ্বীনী শিক্ষা প্রদান করা হবে।

(ছয়) অন্য কিছু স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে আরবি এবং ইতালী ভাষা প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। লিবিয়দের উচ্চ শিক্ষা হতে বঞ্চিত করা যাবে না। ১৯২৩ সালে পাসকৃত আইন যাতে লিবিয়দের উচ্চ শিক্ষার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে, তা বাতিল করতে হবে। সেই সাথে একই বছরে পাস করা আইন যাতে লিবিয় ও ইতালীয়দের মাঝে বৈষম্য রাখা হয়েছে "কোন লিবিয় ইতালীর নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে সে বৈষম্য থাকবে না" তাও দূর করতে হবে।

(সাত) একটি ধর্ম মন্ত্রণালয় থাকবে। এর প্রধান এবং তদারককারী থাকবে মুসলমান।

(আট) ইতালী কর্তৃপক্ষ মুসলমানদের লুট করা সমস্ত মাল সম্পত্তি ফিরিয়ে দিবে।

(নয়) জনগণ একজন নেতা নির্বাচন করবে। এই নেতা দেশের উচ্চ পরিষদের সদস্য হবেন। সব কিছু দেখা-শুনা ও তদারকী করার অধিকার থাকবে তার।

(দশ) বিভিন্ন প্রকার অস্ত্র বহনে আমরা স্বাধীন থাকবো এবং অন্য দেশে ভ্রমণ করার অধিকারও সংরক্ষিত থাকবে।

বাদিলিউ-এর প্রতিনিধি ছিশালিয়ানীর সাথে দীর্ঘ সময় ধরে ওমর মুখতারের আলোচনা হল। ছিশালিয়ানী সমস্ত শর্তগুলো মেনে নিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন, সমস্ত শর্তগুলো তিনি জেনারেলের কাছে পেশ করবেন। ওমর মুখতারের মনে কচি

চাঁদের ন্যায় আশার আলো উঁকি দিল। তিনি ভাবলেন এই শর্তগুলো বাস্তবায়ন হলে দেশবাসীর উপর যে অমানুষিক অত্যাচার চলছে তার অবসান হবে। তাদের মুখে আগের ন্যায় হাসি ফুটে উঠবে। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দে ভরে উঠবে তাদের ঘর-দেহ-মন। তিনি আপাতত যুদ্ধের কথা ছেড়ে আলোচনায় মনোনিবেশ করলেন। বেশ কয়েকবার উভয় পক্ষ আলোচনায় বসলো। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে তারা উপনীত হতে পারলো না।

এরপর মার্শাল বাদিলিউ নিজেই "সিদিরুহুমা"তে ওমর মুখতারের সাথে আ-লোচনায় বসলেন। দীর্ঘ সময় অত্যন্ত সৌহার্দ্য ও আন্তরিকতা পূর্ণ আলোচনার পর জেনারেল ওমর মুখতারকে আশ্বস্ত করলেন যে, খুব তাড়াতাড়ি আন্তর্জাতিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ছিশালিয়ানীর সাথে আলোচিত বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। তিনি নিজেই উল্লেখিত দশটি শর্ত মেনে নিলেন।

আলোচনা শেষে মার্শাল বাদিলিউ বেনগাজিতে ফিরে গেলেন এবং সাংবাদিকদের সামনে ঘোষণা দিলেন যে, ওমর মুখতারের সাথে তাঁর সন্ধি হয়েছে। অবশ্য সন্ধির কোন শর্তের কথা তিনি উল্লেখ করলেন না। এই ঘোষণার সাথে সাথে তিনি সকল যুদ্ধের ময়দান হতে সৈন্য প্রত্যাহার করলেন। ওমর মুখ-তারের মন আশায় ভরে উঠলো। তিনি মনে করলেন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের এবার অবসান ঘটলো। লিবিয়বাসী তাদের স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা ফিরে পাবে। আবার কবিলা কবিলাতে আনন্দের বন্যা বইতে শুরু করবে। কচি বাচ্চারা হাত ধরে গান গেয়ে গেয়ে স্কুলে যাবে। দীর্ঘদিন শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থাকার পর তারা আবার শিক্ষার সুযোগ পাবে। আবার তারা হাদিস, কুরআন, তাফসীর আকিদা পাঠ করতে পারবে। পারবে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে। বিদেশেও যেতে পারবে তারা।

ওমর মুখতারসহ সকল মুজাহীদরা এই ঐতিহাসিক চুক্তির বাস্তবায়নের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলেন। আজ কাল করে করে একমাস অতিবাহিত হলো। জেনারেল মার্শাল বাদিলিউ চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য ফিরে এলেন না। কোন আন্তর্জাতিক প্রতিনিধির অংশ গ্রহণের কথাও শুনা গেল না।

ওমর মুখতার ছিশালিয়ানীর নিকট জেনারেল বাদিলিউ-এর সাথে তার চুক্তি পত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে একটি চিঠি লিখলেন এবং চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ত্বরান্বিত করার জন্য তাগাদা দিলেন। সেই সাথে 'রুকাইয়া' নামক স্থানকে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান এর জন্য নির্ধারণ করলেন।

ছিশালিয়ানী তার উত্তরে ওমর মুখতারকে জানালেন চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হবে বেনগাজিতে। অন্য কোথাও নয়। ওমর মুখতার জানালেন তাতে তার কোন আপত্তি নাই। তিনি তার প্রতিনিধি হিসাবে আলোচ্য শর্তের উপর চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের জন্য হাসান বিন রিদা আস-সানুসী কে বেনগাজিতে পাঠালেন।

পনেরো দিন অতিবাহিত হল। হাসান ফিরে আসে না। ওমর মুখতারের ধৈর্যের বাঁধ টুটে যেতে লাগলো। তিনি অশনি সংকেতের আভাষ পেলেন। কুয়াশার মত একটি হাল্কা অথচ পুরো সন্দেহের জাল তার মনের বিশ্বাসকে আচ্ছাদিত করলো। তিনি অন্য মুজাহীদ নেতাদের ডেকে পাঠালেন। ব্যাপারটি নিয়ে তাদের সাথে আ-লোচনার দরকার। প্রয়োজনবোধে আবার লোক পাঠাতে হবে।

সকল মুজাহীদ নেতারা উপস্থিত হয়েছেন। ওমর মুখতারকে খুব বিচলিত মনে হচ্ছে। অথচ কঠিন বিপদের মুহূর্তেও তাকে কখনো বিচলিত হতে দেখা যায় নি।

ঃ সাইয়্যেদ ওমর! আপনাকে খুব বিচলিত মনে হচ্ছে! কোন গুরুতর ব্যাপার ঘটেছে কি? একজন মুজাহীদ নেতা জানতে চাইলেন।

কিছুক্ষণ চুপ রইলেন ওমর মুখতার। তারপর আস্তে করে বললেন–

ঃ হাসান বিন রিদা এখনো ফিরে এলো না।

ঃ তাতে দুশ্চিন্তার কি আছে?

ঃ আজ কালের মধ্যেই ফিরে আসবে। অন্য একজন বললেন।

ঃ আরো লোক পাঠিয়ে খবর নেওয়া যায়।

ঃ কিন্তু– কিন্তু। থেমে গেলেন ওমর মুখতার।

ঃ বলুন!

ঃ আমি ভাবছি অন্য কথা।

ঃ অন্য কথা!!

ঃ হ্যাঁ!

ঃ কী!

ঃ এখন তা বলতে চাচ্ছি না। তবে হয়ত মারাত্মক কোন ক্ষতির সম্মুখীন হতে চলেছি আমরা।

ঃ চুক্তির শর্তগুলোতো সবই আমাদের পক্ষে।

ঃ সেই জন্য তো ভয়ের কারণ। ইতালীয়রাতো অতো ভদ্র নয়।

ঃ আপনি স্পষ্ট করে বলবেন কি– কী ভাবছেন আপনি?

ঃ হাসান রিদার আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তবে তাকে পাঠানো হয়ত আমাদের ভুল হয়েছে।

ঃ সে খুবই বিচক্ষণ ও যোগ্য ব্যক্তি আমাদের মধ্যে। তাঁর পিতাও ছিলেন সম্মানিত ব্যক্তি।

ঃ সবই ঠিক। যা হোক আপনাদের ডাকার কারণ— আমার মনে যে বিপদের অশনি সংকেত বেজে উঠেছে সেটিই আপনাদের জানিয়ে দেয়া।

হাসান বিন রিদা বেনগাজিতে পৌছালে ইতালীয়রা তাঁকে প্রাণঢালা অভ্যর্থনা ও মাত্রাতিরিক্ত আতিথেয়তা দেখাল। তারপর অর্থ, পদ ও অন্যান্য আকর্ষণীয়

প্রলোভনে তাকে বশীভূত করে ফেল্ল। যেমনটি করা হয়েছিল তার পিতা জনাব রিদার ক্ষেত্রে। পনের দিন পরে হাসান বিন রিদা ফিরে এলো। তবে অন্য হাসান বিন রিদা হয়ে। তার মুখের ভাষার সুর ভিন্ন। মুজাহীদদের নিকট অনেক দূরের মানুষ মনে হলো তাকে। সে স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র ওমর মুখতারের নিকট পেশ করলো। স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র দেখে ওমর মুখতারের চেহারা পাল্টে গেল। শান্ত-ভদ্র ধীর গতির এই মানুষটির এমন চেহারা দেখা যায়নি কখনো। স্বল্পভাষী ওমরের চেহারায় ধিক্কারের চিহ্ন ফুটে উঠলো। সাথে সাথে ফুটে উঠলো ক্ষোভ ও অপমানের চিহ্ন। তিনি তাকে বললেন ঃ

ঃ গুরুকা ইয়া বুনাইয়া! বিমাতায়িদ দুনিয়া

----(হে বৎস! ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সম্পদ তোমাকে ধোকা দিল?) তুমি এই ধরনের অপমানিত ও পরাজয়মুলক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছে! ধিক, শত ধিক তোমাকে!!

হাসান তার উত্তরে বল্‌লো–

ঃ আমি ইতালী সরকারের সাথে এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছি। আমার পক্ষে তা ভাঙা সম্ভব নয়।

বাংলার ইতিহাসের মীর জাফরের সাথে হয়ত হাসান বিন রিদার উপমা মেলে। তাকে নির্দিষ্ট চুক্তি পত্রে স্বাক্ষরের জন্য পাঠানো হলো বেনগাজিতে। আর সে অন্য চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে ফিরে এলো। প্রলোভন ও অর্থ মানুষকে কত নীচু ও অমানুষ করে দেয় লিবিয়ার ইতিহাসে তার উপমা হাসান বিন রিদা।

ওমর মুখতার সমস্ত মুজাহীদ নেতা ও বিভিন্ন গোত্র প্রধানকে ডেকে পাঠালেন। তারপর তিনি সমবেত নেতা কর্মীদের সম্বোধন করে বললেনঃ

ঃ আমি অত্যন্ত দুঃখিত আপনাদের কষ্ট দেবার জন্য। কিন্তু আপনাদের না জানিয়ে আমার একার সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না বিধায় আপনাদের ডাকা। সর্বোপরি বিষয়টি সম্পর্কে আপনাদের স্বচ্ছ ও সঠিক ধারণা থাকার দরকার।

ঃ সাইয়্যেদ ওমর! বিষয়টি কি একটু খুলে বলুন। এক গোত্র প্রধান জানতে চাইলেন।

ঃ শেখ সালবী মাদানী! সেটি বলার জন্যই আপনাদের ডেকেছি। হাসান বিন রিদাকে আমাদের প্রতিনিধি হিসাবে পূর্বে উল্লেখিত চুক্তি পত্রে স্বাক্ষরের জন্য বেনগাজিতে পাঠান হয়েছিল। তা আপনারা জানেন?

ঃ জানি।

ঃ হাসান ফিরে এসেছে। একটি চুক্তি পত্রেও স্বাক্ষর দিয়ে এসেছে। কিন্তু মার্শাল জেনারেল বাদিলিউ-এর সাথে আমার যে চুক্তি হয়েছিল, তার একটি শর্তও

এই চুক্তি পত্রে নাই। অনুগ্রহ করে আপনারা একটু ধৈর্য ধরে শুনুন। আমি আপনাদের তা পাঠ করে শুনাচ্ছি। চুক্তিগুলো হলো ঃ

(এক) ইতালী সরকার ওমর মুখতারের সৈন্যদেরকে জাতীয় সৈন্য বাহিনীর সদস্য হিসাবে স্বীকার করে নিচ্ছে।

(দুই) ওমর মুখতারের সৈন্যরা শুধু মাত্র জারদাস এলাকায় অবস্থান করবে।

(তিন) ইতালী সরকার সকল মুজাহীদ অফিসার ও সৈন্যদের মাসিক বেতন দিবে।

(চার) ওমর মুখতারের সকল অফিসার ও সৈন্য ইতালী অফিসারের অধীনে থাকবে।

(পাঁচ) ইতালী সরকার তাদের ইচ্ছামত ওমর মুখতার বাহিনীকে দেশের যেকোন স্থানে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখবে।

(ছয়) ইতালী সরকার ওমর বাহিনীর সৈন্যদের অস্ত্র পরিবর্তন করার অধিকার রাখবে। ইচ্ছামত যে কোন অস্ত্র তাদের হাতে দিতে পারবে।

(সাত) ইতালী সরকার ওমর মুখতার বাহিনীর যে কোন সৈন্যকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করতে পারবে।

(আট) এই চুক্তির পূর্বে ওমর বাহিনীর কোন সৈন্য যে অপরাধ করেছে ইতালী সরকার তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারবে। এ ব্যাপারে ওমর মুখতারের বাধা দেবার কোন ক্ষমতা থাকবে না।

(নয়) ওমর বাহিনীর যে অফিসার ইতালী ভাষা জানবে না বা শিখবে না, তাকে তার পদ হতে বাদ দেওয়া হবে।

(দশ) ওমর বর্তমানে যে এলাকা দখল করে আছে, ইতালী সরকার সে এলাকার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করবে। ওমর এর জন্য কোন এলাকা থাকবে না।

(এগারো) জনাব হাসান বিন রিদা সানুসুর জন্য মাসিক পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক মাসিক বেতন নির্ধারণ করা হল এবং তার জন্য বেনগাজিতে একটি মনোরম প্রসাদ বানিয়ে দেওয়া হবে।

(বারো) ওমর মুখতারের জন্যও মাসিক পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক বেতন নির্ধারণ করা হলো এবং তার জন্য ঝাওয়াতুল কুসূরে একটি মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হবে। তার পাশেই তার বাসস্থান থাকবে। ওই মসজিদে তিনি ছেলে-মেয়েদেরকে শিক্ষা দিবেন। জনগণ তার সাথে অবাধে দেখা সাক্ষাত করতে পারবে।

চুক্তিপত্রের শর্তগুলো পাঠ করে ওমর মুখতার সকলের মুখের দিকে একবার তাকালেন। তারপর বললেন—

"আমি এই শর্তে রাজি নই। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরব ভাল, তবুও আমার নিজেকে এবং আমার দেশবাসীকে ইতালীয়দের হাতের পুতুল হিসাবে ছেড়ে দিবো না। এই আমার মত।"

তিনি আবার কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। সকল মুজাহীদ ও গোত্র নেতাদের মুখ অপমান ও ক্ষোভে লাল হয়ে উঠেছে। তাদের চোখে ফুটে উঠেছে প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার আগুন।

"আপনারা কি এই শর্তে রাজি আছেন না রাজি নন?"

ঃ না, আমরা এই শর্তে রাজি নই।"

সকলে এক সাথে বলে উঠলো।

## ॥ ১৪ ॥

আলোচনা সভা উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। মুজাহীদ নেতৃবৃন্দ ও গোত্র প্রধানগণ হাসান বিন রিদার এহেন ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণে মর্মাহত হলেন। মর্মাহত হলেন প্রতিনিধি হিসাবে সমস্ত লিবিয়দের ধোঁকা দেবার কারণে। অনেকে তাকে ধিক্কার দিলেন। গালমন্দ ও কটুক্তি করলেন অনেকে। কিন্তু হাসান অনড় তার সিদ্ধান্তে। সে বললো;

ঃ অবশ্যই শর্ত মেনে নিতে হবে।

ঃ তুমি সৃষ্টি কর্তা নও।– বয়োবৃদ্ধ মুজাহীদ নেতা শেখ শরীফ কাসেম বলতে থাকেন। বরং তুমি আমাদের মতই সৃষ্টজীব। আর সৃষ্টজীবের জন্য অন্যায় কাজে স্রষ্টার বিরোধিতা করা উচিত নয়। অতএব তোমার কথা ঠিক নয়।

ঃ না, আমি যা বলছি তা ঠিক। এ শর্ত আমাদের জন্য কল্যাণকর।

ঃ তা তোমার দৃষ্টিতে হতে পারে। কেননা, লোভ ও মোহে তুমি অন্ধ এখন।

ঃ অন্ধ আমি নই। অন্ধ আপনারা। নিরীহ অধিবাসীদের উপর যে অত্যাচার চলছে প্রতিদিন, তা আপনারা বন্ধ করবেন কিভাবে? যুদ্ধ করে?

ঃ আহমকের মত কথা বলছ তুমি। তোমার স্বাক্ষরকৃত চুক্তি মেনে নিলে , ইতালীয়রা তোমাদের সাথে জামাই আদর করবে– এটি তুমি ভাবলে কি করে? দুঃখ এখানে, তাদের স্বরূপ অনুধাবনে তুমি অনেক পিছিয়ে আছ।

চুপ রইল হাসান বিন রিদা। অন্য একজন মুজাহীদ নেতা এবার মুখ খুললেন–

ঃ তোমাকে আমাদের প্রতিনিধি হিসাবে নির্দিষ্ট চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তুমি তা করনি। করেছ নিজের ইচ্ছাকৃত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর। তাই সমস্ত জাতির কাছে তুমি অপরাধী। সবার কাছে তোমার ক্ষমা চাওয়া উচিত।

ঃ সেটি কখনই হবে না।– রাগত স্বরে হাসান বলে উঠলো। আর আমি আপনাদের সাথে নেই।–

একথা বলে হাসান তার অনুগত প্রায় তিন'শ মুজাহীদ নিয়ে ওমর মুখতার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

সকলের সাথে পরামর্শ করে ওমর মুখতার ছিশালিয়ানির (বেনগাজির দায়িত্ব প্রাপ্ত ইটালীয় কর্মকর্তা) নিকট চিঠি লিখলেন। তাতে তিনি উল্লেখ করলেন যে, ইতোপূর্বে যে সমস্ত শর্তে তারা ঐক্যমতে পৌঁছেছিল, তার চুক্তিপত্রের স্বাক্ষর ত্বরান্বিত করা হোক। কিন্তু ছিশালিয়ানির থেকে কোন উত্তর এলো না। তিনি পুনরায় লিখলেন। কিন্ত তারও কোন উত্তর এলো না। ওমর মুখতার প্রায় ছয় মাস অপেক্ষা করলেন মার্শাল জেনারেল বাদিলিউ-এর সাথে ঐক্যমতে পৌছা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের জন্য। তাঁর আপেক্ষার শেষ হলো এক সময়, কিন্তু চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর হলো না।

এদিকে ইতালীয়রা ওমরকে বশ করার জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করলো। তারা এক মিলিয়ন ফ্রাংক ওমরকে উপঢৌকন হিসাবে প্রেরণ করলো। কিন্তু দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী এই বীর তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন।

এতো কিছুর পরও ওমর মুখতার ধৈর্য হারালেন না। তিনি ছিশালিয়ানির নিকট আবার একটি পত্র দিলেন। তাতে তিনি উভয়ের মধ্যে একটি বৈঠকের আহ্বান জানালেন এবং চুক্তিস্বাক্ষর বিলম্বিত হওয়ার কারণ সেখানে আলোচনার প্রস্তাব দিলেন। এবার চিঠির উত্তর এলো। কিন্তু সে উত্তর ওমর মুখতারকে হতাশাগ্রস্থ করলো। তিনি লিখেছেন–

"আমি আপনার সাথে সাক্ষাত করতে আগ্রহী নই। সেই সাথে আপনার সাথে আলোচনা করতেও আগ্রহী নই। ইতোপূর্বে যে চুক্তি হয়েছিল তা আমি ভেঙে দিলাম। বর্তমানে যে চুক্তি হয়েছে সেভাবেই সব কিছু হবে।"

এরপর ওমর মুখতার আবূ বকর বারসায়ী নামের জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে বেনগাজির শাসনকর্তার উপদেষ্টা মিঃ শারিফ গরইয়ানীর নিকট হতে একটি চিঠি পেলেন। চিঠির ভাষা হলো এরূপ–

" ইতালী সরকার যে কোন ঘটনা মোকাবেলার জন্য সদা প্রস্তত। তার জন্য কোন ঘোষণার প্রয়োজন হবে না।--------- ।"

ওমর মুখতার বুঝলেন– ইতালীরা মূলতঃ শান্তি চায় না। চায় না চুক্তি। তারা চায় সময়। এই সময়ের মধ্যে তারা নিজেদেরকে যেমন গুছিয়ে নিয়েছে, তেমন এনেছে নতুন অস্ত্র, গোলাবারুদ ও সৈন্য। সেই সাথে তারা আর একটি প্রহসনের খেলা শুরু করলো। পত্র পত্রিকার মাধ্যমে ঘোষণা দিল– " ইতালী সরকার মুজাহীদদের সাথে যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা দিচ্ছে।" ১৯২৯ সালের মাঝামাঝি মার্শাল জেনারেল বাদিলিউ-এর কণ্ঠে এই ঘোষণা দেওয়া হয়। ঘোষণায় বলা হয়, দুইমাস যুদ্ধ বন্ধ থাকবে এবং সায়্যেদ ইদ্রিসকে আলোচনার জন্য নির্বাচন করা হল। কিন্তু যখন আলোচনার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হলো– তখন জানানো হলো, আলোচনার জন্য যাকে নির্বাচন করা হয়েছে, তিনি রাষ্ট্রীয় কাজে রোমে অবস্থান করছেন। তাই

শান্তিচুক্তি আরো দশ দিন বাড়ানো হলো। ওমর মুখতার বুঝলেন– এটাও তাদের সময় নেবার আরো একটি প্রহসন। মূলতঃ বিভিন্ন অছিলায় সময় নিয়ে আসলে তারা তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করছে এবং মুজাহীদদের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে বিভেদের চেষ্টা চালাচ্ছে।

ওমর মুখতার যা ভেবেছিলেন বাস্তবে হলোও তাই। ২৬ জানুয়ারি তারা ওমর বাহিনীর উপর বিমান হামলা চালাল। দীর্ঘ দিন যুদ্ধ বন্ধ থাকার পর আবার রণ দামামা বেজে উঠলো। তারা চিন্তা করলো হাসান বিন রিদা পৃথক হওয়া সত্ত্বেও যখন ওমর মুখতার কাবু হলেন না, বরং অনড় থাকলেন, তখন তারা ওমর ও তার দলবলকে বন্দী করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো। তারা একের পর জাবালে আখদারে বিমান হামলা চালিয়ে মুজাহীদদের অতিষ্ঠ করে তুললো।

অন্য দিকে হাসান রিদার মাধ্যমে তারা জানিয়ে দিলো, যদি ওমর মুখতার ইতালীদের কাছে আত্ম সমর্পন না করে তবে (১৯৩০ সালের) ফেব্রুয়ারী মাসে মুখতার বাহিনীকে বোমা বর্ষণ করে শেষ করে দেওয়া হবে। ঠিক এই সময় হাসানের সমর্থক অনেক মুজাহীদ ওমর এর দলে ফিরে এসে ইতালীদের প্রতিরোধে এগিয়ে এলো।

হাসানের মাধ্যমে এবং তার পিতার মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালিয়ে ইতালীরা যখন ওমরকে বশ অথবা বন্দী করতে ব্যর্থ হলো, তখন তারা অত্যন্ত মারাত্মক ও ভয়াবহ একটি পথ বেছে নিল।

সেপ্টেম্বর, ১৯৩০।

জাবালে আখদার এলাকার জনগণ ঘুম থেকে উঠে তাদের প্রাত্যহিক কাজ কর্মে মনোনিবেশ করেছে। হঠাৎ চারিদিক হতে ইতালী সৈন্যরা তাদের ঘিরে ফেললো। যারা পালানোর চেষ্টা করলো বা প্রতিবাদ করলো তার দেহ বুলেটের আঘাতে ঝাঝরা করে দেওয়া হল। তাদের ঘর থেকে আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে টেনেহিচড়ে বের করা হল। ঘরে রক্ষিত সম্পদ ও খাদ্য দ্রব্য বের করে একটি ময়দানে স্তুপ করে তাতে আগুন ধরানো হল। দেখতে হৃষ্ট-পুষ্ট ও কম বয়সের মহিলাদেরকে আলাদা ট্রাকে উঠিয়ে আগে চালান দেওয়া হল। এরপর তাদের গরু-বাছুরসহ সমস্ত মানুষকে আইনে গাজালা এবং উকাইলাতে নিয়ে যাওয়া হলো।

দীর্ঘ পাঁচ/ছয় ঘন্টার অপারেশনে সমস্ত জাবালে আখদার এলাকা শ্মসানে পরিণত হল। ঘর-বাড়ি ও ফসলে আগুন লাগানোর ফলে সমস্ত এলাকা বিরান ভূমিতে পরিণত হল। উত্তপ্ত মরুতে তারকাটার বেড়ার মধ্যে জন্তু-জানোয়ারের মত মানুষগুলোকে ফেলে রাখা হল। অল্পাহারে, অর্ধাহারে, ঔষধের অভাবে প্রতিদিন একের পর এক নিরাপরাধ মানুষগুলো মরতে লাগলো।

ওমর মুখতার বুঝলেন কি ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন তিনি। তিনি সমস্ত

জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। এখন তাকে মরুতে এবং পাহাড়ের গুহাতে অবস্থান করতে হবে। কারো থেকে সাহায্য সহযোগিতা ও সহানুভূতি পাওয়া যাবে না। এভাবে গণ বিচ্ছিন্ন হয়ে বেশিদিন টিকে থাকা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু অসমসাহসী বীর ওমর মুখতার একটুও আশাহত হলেন না। তার আগাধ বিশ্বাস আল্লাহর উপর। সাহায্য তো সেখান থেকেই আসে।

ওমর মুখতারকে গণ বিচ্ছিন্ন করার পর ইতালী বাহিনী তার শেষ ও শক্ত ঘাঁটি "কুফর" আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিল এবং সেভাবেই তারা প্রস্তুতি শুরু করলো। এ সময় জেনারেল বাদিলিউ-এর সহকারী হিসাবে জারাজায়ানী বারকা-এর শাসক নির্বাচিত হন। বারকা-এর শাসক নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি তার কর্ম তৎপরতা বাড়িয়ে দেন। অভিনব রণ কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি মুখতার বাহিনীকে নানাভাবে হয়রানি করতে শুরু করেন। তিনি অনেকটা গেরিলা ধরনের চোরা-গোপ্তা আক্রমণ চালিয়ে মুজাহীদদের মনোবল দূর্বল ও আত্ম সমর্পনের জন্য চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখেন। সেই সাথে লিবিয় এবং ইতালীয় নাগরিকদের উপর সদা তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে শুরু করেন। বিশেষ করে বেনগাজিতে অবস্থানরত জনগনের উপর। সেই সাথে মিসরের সাথে লিবিয়ার বর্ডারকে একেবারেই বন্ধ করে দিলেন।

বারকাতে উপস্থিত হওয়ার পর জারাজায়ানী একটি ভীতিমূলক প্রহসনের পথ বেছে নেন। ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে তিনি জরুরী স্থানান্তরশীল আদালত গঠন করেন। কোথাও কোন লিবিয় জনগণ অথবা মুজাহীদ ধরা পড়লে বা তাদের অমনোপুত কোন কাজ করলে সাথে সাথে তিনি এই আদালতের মাধ্যমে বিচার করে স্থানীয় প্রশাসন দ্বারা সেই বিচার তখনই বাস্তবায়নে ত্বরিৎ ব্যবস্থা নিতে শুরু করলেন। এতে করে জনগনের মনে বেশ ভয়ের সঞ্চার হলো।

১১ এপ্রিল ১৯৩০ সাল।

ওমর মুখতার হঠাৎ করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন জারাজায়ানী বাহিনীর উপর। প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলো। জারাজায়ানী ওমরকে বন্দী করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন। তিনি তিন চাকার মোটর সাইকেল চড়ে সৈন্যদের উদ্দেশ্যে হুংকার ছাড়লেন।

ঃ যাও, ঝাঁপিয়ে পড়। মৃত অথবা জীবিত, আমি ওমরকে চাই।

ঃ স্যার, আমাদের থেকে ওরা সুবিধাজনক স্থানে রয়েছে।– এক মেজর মন্তব্য করল।

ঃ আমি কোন অজুহাত শুনতে চাই না। চারিদিক থেকে ঘিরে ধর ওদের। সৈন্য, অস্ত্র কোনটির অভাব নাই আমাদের।

ঃ স্যার, তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি।

ঃ ট্যাংক বাহিনীর সাহায্য নিন।

ঃ ওকে স্যার।

ঃ আর্টিলারী বাহিনীকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে বলুন।

ঃ ওকে স্যার।

ঃ যান, কুইক।

ঃ ক্যাপটেন বিদালিউছি!

ঃ স্যার।

ঃ তুমি ঐ দিকটায় যাও।

ঃ ওকে স্যার। তবে–

ঃ তবে কি?

ঃ ও দিকটায় আমাদের অনেক সৈন্য হতাহত হয়েছে। পাহাড়ের ছোট ছোট গুহা ও বালুর আড়ালে ওরা লুকিয়ে রয়েছে।

ঃ ওহ! আমি চাই ওমর মুখতারকে। অন্য কোন কথা আমি শুনতে চাই না। যাও, কুইক।

ঃ ওকে স্যার।

ক্যাপটেন বিদালিউছির বেশিদূর এগোনো হলো না। একটি গুলি এসে তার মাথার খুলি উড়িয়ে দিল। জারাজায়ানী চেয়ে দেখলেন। গুলি আসার উৎস লক্ষ্য করে এবার নিজেই তিনি গুলি ছুঁড়তে শুরু করলেন। সেই সাথে হুংকার ছাড়লেন।

ঃ এ্যাডভ্যান্স। একটি প্রাণীকেও জীবিত রাখবে না। ওদের যুদ্ধের সাধ মিটিয়ে দাও।

ঃ সাইয়্যেদ ওমর। ওমরের একান্ত সহকর্মী শীহাব বিন কাসিম কথা বলছেন।– ওরা যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা ধরা পড়বো।

ঃ ঠিক বলেছ।

ঃ কী করবো এখন?

ঃ সবাইকে কৌশলে পিছু হটার নির্দেশ দাও।

ঃ হাদের।

ঃ শোন।

ঃ বলুন।

ঃ ওই যে, ঐ, দেখতে পাচ্ছো?

ঃ কী!

ঃ জারাজায়ানী!

ঃ হ্যা!

ঃ এখনো সে আমাদের রেঞ্জের বাহিরে। যদি সে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়, তবে তাকে ছাড়বে না। হাসান ফারুক কে জানিয়ে দাও কথাটি।

ঃ হাদের সাইয়্যেদ।

ঃ যাও, সকলকে পিছু হটার নির্দেশ দাও।

ঃ সাইয়্যেদ ওমর।–বিচলিত কণ্ঠ শিহাব বিন কাসিমের।

ঃ কী!

ঃ ওই দেখুন। কজন ইতালী সৈন্য। খুব নিকটে পৌছে গেছে। তাড়াতাড়ি মাথা নীচু করুন। ওরা আমাদের দেখে ফেলেছে।

বলতে বলতে-ই একঝাক গুলি ওদের মাথার উপর দিয়ে শা শা শব্দ করে উড়ে গেল। শীহাব হামাগুড়ি দিয়ে জায়গা পরিবর্তন করে অতর্কিতে তাদের উপর গুলি ছুঁড়লেন। ওদের মরদেহ গড়িয়ে গড়িয়ে টীলার গোড়ায় গিয়ে থেমে গেল।

জারাজায়ানী বাহিনী তন্ন তন্ন করে খুঁজে একটি জীবিত মুজাহীদের সন্ধানও পেল না। তারা যে কীভাবে পালাল তাও তারা বুঝতে পারলো না। জেনারেল জারাজায়ানী রাগে ও ক্ষোভে ফুসতে লাগলেন। তার রণ কৌশলের জ্ঞানে বোধগম্য হলো না– কীভাবে মুখতার বাহিনী এখান থেকে ভেগে গেল। কী কৌশল জানে ওমর মুখতার!!

বিমুঢ় বিস্ময়ে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে জেনারেল জারাজায়ানী উদাসভাবে চেয়ে রইলেন দিগন্তের পানে। রণ কৌশলে শিক্ষিত নয় ওমর। বয়স সত্তর উর্ধ। একজন সামান্য স্কুল মাস্টার অথচ এতো রণ কৌশল, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা কোথা থেকে অর্জন করলো সে!! তার এতো জনপ্রিয়তা কেন? কেন মানুষ তাকে ভালে-বাসে! লিবিয়ার আপামর জনসাধারণ তার কথায় প্রাণ দিতে প্রস্তত কেন? কি যাদু জানে সে? কোন শক্তি বলে সে এই জনপ্রিয়তা ও নেতৃত্বের অধিকারী হলো? সাল-াম ওমর– শত সালাম তোমাকে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এক সামরিক বাহিনীকে ঘোড়ায় চড়ে পুরানা মডেলের রাইফেল দিয়ে তুমি কেমনভাবে তাদেরকে নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছ!– ধন্য- তু--

ঃ স্যার! মেজর হিতাশি বালুনী পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

ঃ বলুন।

ঃ ওরা ভেগে যাচ্ছে স্যার! এই দেখুন।

বাইনোকুলার এগিয়ে দিল বালুনী। জারাজায়ানী বাইনোকুলার চোখে ধরে দেখলেন একদল ঘোড় সওয়ার বাহিনী দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সকলের পরনে সাদা ঢিলা পোশাক, কাঁধে রাইফেল।

ঃ ফলো দেম।

## ॥ ১৫ ॥

জাবালে আখদারের "কুফর"। মূল ঘাঁটি ওমর মুখতারের। কুফরের পতন ঘটলে মুজাহীদদের পতন নিশ্চিত। জারাজায়ানী ব্যাপারটি ভালোভাবেই উপলব্ধি করলেন। তাই তিনি আটসাট বেঁধে কুফর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

৩রা জানুয়ারি ১৯৩১ সাল।

জারাজায়ানী সংবাদ পেলেন ওমর মুখতার তার বাহিনী নিয়ে কুফর এর হাওয়ারী নামক উপত্যকায় অবস্থান করছেন। পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিল জারাজায়ানী। বিমান বাহিনী, ট্যাংক বাহিনী ও কামান বাহিনীর সহায়তায় তিনি মুজাহীদদের উপর আক্রমণের জন্য রওনা হলেন।

ছোট বড় পাহাড় সবদিকে। পাহাড়ের সমস্ত শরীর জুড়ে পাহাড়ী গাছ। তার পাদদেশ ছোট বড় সবুজ বিস্তৃর্ণ খোরমা বাগান। পাহাড়ের অদূর দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট্ট একটি মরু নদী। ছোট ছোট ঢেউ বাতাসে নেচে নেচে খেলা করছে। তার উপর সূর্যের আলো পড়ে চিকচিক করছে। মাছ শিকারী পাখিরা শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ওমর মুখতার। আগের মত শরীরে বল নাই। মনের বলও কেমন যেন কমে গেছে। ইতালী বাহিনীর মোকাবেলায় আর কদিন টিকে থাকা যাবে, কে জানে! খাদ্য নাই পর্যাপ্ত। নাই ঔষধ, অস্ত্র গোলা বারুদ। জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন। কোন সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে ইতালী বাহিনী মরিয়া হয়ে উঠেছে। যে কোন মুহূর্তে তারা কুফর আক্রমণ করতে পারে। অবশ্য কুফর আক্রমণ করলে তাদের চরম খেসারত দিতে হবে। অত সহজে তারা কুফর জয় করতে পারবে না। কিন্তু কুফর যদি তারা দখল করে নেয় তা হলে। তা হলে কী হবে-----।

ভাবতে ভাবতে ওমর মুখতার কখন যেন তন্দ্রার কোলে ঢলে পড়েছিলেন। ঘনিষ্ঠ সাথী শিহাব বিন কাশিমের চোখেও তন্দ্রার আবরণ পড়তে শুরু করেছিল। হঠাৎ যন্ত্রদানবের শব্দে তার সে আবরণ দূর হয়ে গেল। ওমর মুখতারের শরীরে ধাক্কা দিলেন তিনি।

ঃ কি শিহাব? ক্লান্ত কণ্ঠ ওমর মুখতারের।

ঃ শব্দ।

ঃ শব্দ ! কিসের শব্দ?

ঃ মোটর গাড়ির।

কান খাড়া করলেন ওমর মুখতার। হ্যাঁ মোটর গাড়ির শব্দ। তবে বেশ দূরে মনে হচ্ছে। শরীরের অলসতা দূর করে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। খুব দ্রুত পাহাড়ের টীলায় উঠে গেলেন। কোমরে ঝুলানো বাইনোকুলার চোখে ধরলেন। কিন্তু একি!! বিশাল ইতালী বাহিনী হন্যে হয়ে এদিকে ছুটে আসছে!

ঃ শিহাব।

ঃ সাইয়্যেদ ওমর!

ঃ আমাদের সৈন্যরা প্রস্তুত?

ঃ সম্পূর্ণ প্রস্তত।

ঃ খুব দ্রুত তুমি আর একবার তদারকি করে আস।

সাবধান! কোনক্রমেই যেন ওরা বুঝতে না পারে আমরা এখানে লুকিয়ে আছি।

ঃ সে ভাবেই নির্দেশ দেওয়া আছে।

ঃ ওরা ব্রিজ পার না হওয়ার আগে একটি গুলিও তাদের প্রতি ছোঁড়া হবে না। আমার নির্দেশের পরই আক্রমণ শুরু হবে।

ঃ তাই হবে সাইয়্যেদ।

জারাজায়ানী ব্রিজের অপর প্রান্তের নিকটে এসে তার বাহিনীকে অগ্রসর হতে নিষেধ করলেন। দূরবীণ দিয়ে সমস্ত এলাকাটি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন। না, কোথাও কোন শত্রু আছে বলে মনে হচ্ছে না। তবে দৃশ্য বেশ মনোরম। নয়নাভিরাম। ছোট বড় অনেক পাহাড়। তার উপর সবুজের প্রলেপ। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট নদী। এক অভূতপূর্ব দৃশ্য! মনে হচ্ছে অভিজ্ঞ শিল্পীর হাতে আঁকা এক দৃষ্টি নন্দিত ছবি।

জারাজায়ানী একজন অফিসারের নেতৃত্বে পনের বিশ জনের একটি দল পাঠালেন ব্রিজটি পরীক্ষা করার জন্য। অফিসার সৈন্য নিয়ে খুব সতর্কতার সাথে সমস্ত ব্রিজটি চেক করলো। না, কোথাও কোন শত্রু সৈন্য লুকিয়ে নেই। ব্রিজ ধ্বংস করার জন্য কোন বোমাও পাতা নেই। অফিসার ব্রিজের এপ্রান্তে পৌছে গেলেন। তার পর কোমরে ঝুলান দূরবীণ দ্বারা চারিপাশ ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলেন। না, কোথায় কোন শত্রু সৈন্য নাই। তবে জায়গাটি বেশ মনোরম!!

তিনি নিশ্চিত হয়ে অপর প্রান্তে অপেক্ষমাণ সৈন্যদের অগ্রসর হবার জন্য ইশারা করলেন। বেশ দূরত্ব বজায় রেখে এক একটি গাড়ি ব্রিজের উপর উঠতে লাগলো। এক এক করে আট দশটি গাড়ী ব্রিজ পার হয়ে এলো। ব্রিজের উপরে ছয় সাতটি।

ব্রিজ পাহারার দায়িত্ব অর্পিত হুফা কচ্ছাফির উপর। অত্যন্ত সাহসী ও মেধাবী এই যুবক ইতোপূর্বে অনেক দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নিয়েছে। হুফা কচ্ছাফির ধৈর্যের বাধ ছুটে যাচ্ছে। এতো দেরী করছেন কেন ওমর মুখতার। এখনো গুলি ছোঁড়ার নির্দেশ দিচ্ছেন না কেন? ওরাতো সবাই এপাশে পৌছে গেল। আরো দেরী করলে তো সমস্যায় পড়তে হবে।

হুফা কচ্ছাফির তর সইছেনা। মোক্ষম সময় এখন। এখনি ফায়ার করতে হবে। মেশিন গানের ট্রিগারে আঙ্গুল চেপে সংকেত পাবার আশায় অপেক্ষা করছে সে। হঠাৎ সংকেত এলো। এক সাথে গর্জে উঠলো অনেকগুলো মেশিনগান ও রাইফেল। কোথা দিয়ে কি হলো বুঝতে পারলো না ইতালী বাহিনী। কিছু বুঝে উঠার আগেই অনেকে লাশ হয়ে পড়ে গেল। ব্রিজের উপর যে গাড়িগুলো ছিলো তার কয়েকটি রেলিং ভেঙে গভীর খাদে পড়ে গেল। দুই তিনটিতে আগুন ধরে গেল প্রতিপক্ষের উপর ইতালী বাহিনী গুলি ছোঁড়ার তেমন কোন সুযোগই পেল

না। জারাজায়ানী দূর থেকে এদৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। কোথায় লুকিয়ে ছিল ওমর বাহিনী!!

চুরুটে আগুন সংযোগ করলেন তিনি। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে। প্রথম চান্সেই এমন আঘাত খেতে হবে ভাবতে পারেননি। তিনি দূরবীণ দিয়ে আরো ভালো করে এলাকাটি পর্যবেক্ষণ করলেন। অগ্রসরমান সব গাড়িই প্রায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। আগুন জ্বলছে অনেকগুলিতে। অনেকগুলি উপর দিকে চাকা উল্টিয়ে আকাশ দেখছে। অধিকাংশ সৈন্যই মারা গেছে। বেশ কজন আহত হয়ে পড়ে আছে মাটিতে।

জেনারেল জারাজায়ানী ট্যাংক বাহিনীকে অগ্রসর হবার নির্দেশ দিলেন। সেই সাথে নির্দেশ দিলেন ট্যাংকের আড়ালে সৈন্যদের অগ্রসর হবার।

একের পর এক ট্যাংক ব্রিজের উপর উঠছে। তার আড়ালে দশ বারোজন করে সৈন্য অগ্রসর হচ্ছে। সকলের হাতে ভারী এবং অত্যাধুনিক অস্ত্র। হুফা কাচ্ছাফি কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। এ মুহূর্তে ওমর মুখতারের সাথে পরামর্শ করাও সম্ভব নয়। অন্য দিকে ট্যাংক বাহিনীর গতিরোধ করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। তেমন কোন অস্ত্র তার নিকটে নাই।

মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ার করতে করতে প্রথম ট্যাংক অগ্রসর হচ্ছে। ব্রিজের উপর আগুন ধরে পড়ে থাকা দুটি জিপ ও ট্রাক ঠেলতে ঠেলতে অপর প্রান্তে নিয়ে আসলো সেটি। দেখতে দেখতে বারো চৌদ্দটি ট্যাংক এপাশে পৌঁছে গেল। হুফা কাচ্ছাফির সৈন্যরা তাদের উপর বৃষ্টির ন্যায় গুলি বর্ষণ শুরু করলো। কিন্তু তেমন সুবিধা করতে পারলো না। ইতোমধ্যে ইতালী সৈন্যরা অনেকেই পজিশন নিয়ে নিয়েছে। অনেকে ট্যাংকের পিছু থেকে গুলি ছুঁড়ছে। গুলির উৎস লক্ষ্য করে একেকটি ট্যাংক এক এক দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ছোট-বড় গাছ, উচু-নিচু ঢিবি মাড়িয়ে ট্যাংক অগ্রসর হচ্ছে। মাটির নীচের গর্তে লুকিয়ে থাকা অনেক মুজাহীদের জীবন্ত কবর হলো। যারা গর্ত থেকে বের হবার চেষ্টা করলো তাদের দেহ মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল। ট্যাংক বাহিনীর আক্রমণের মুখে হুফা কাচ্ছাফির প্রতিরোধ তুষের বাঁধের ন্যায় নস্যাত হয়ে গেল। হুফা কাচ্ছাফি শহীদ হলেন। শহীদ হলেন তাঁর অনুগত সকল মুজাহীদ।

ওমর মুখতার দূর থেকে সব দেখলেন।

ঃ শিহাব।

ঃ সাইয়্যেদ।

ঃ দেখছ।

ঃ দেখলাম।

ঃ এখন কি করা?

ঃ ট্যাংক বাহিনী আরো অগ্রসর হোক। পাহাড়ের পাদদেশে এলেই এগুলোকে আমরা ধ্বংস করতে পারবো।

ঃ ঠিক বলেছো। ওখানেই ট্যাংক বিধ্বংসি বোমা রয়েছে!

ঃ হ্যাঁ। তবে ভয়ের আরো ব্যাপার রয়েছে।

ঃ কী?

ঃ পিছনে ওদের কামান বাহিনী রয়েছে। আমার মনে হয় ট্যাংক বাহিনীর অগ্রসরের সাথে সাথে কামানগুলো গর্জে উঠবে।

ঃ ঠিক বলেছ তুমি।

ঃ ঐ দেখুন। সাজোয়া গাড়িগুলো সব প্রায় ব্রিজ পার হয়ে এসেছে।

ঃ আসতে দাও। শোন।

ঃ বলুন।

ঃ দক্ষিণ পূর্ব দিকে ওদের অগ্রসর অব্যাহত রাখতে হবে। এজন্য তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নাও।

ঃ ঠিক আছে জনাব।

'ইতালী বাহিনী আরো কিছুদূর অগ্রসর হলো। মুজাহীদ বাহিনী তাদের উপর গোলা বর্ষণ শুরু করলো। পাহাড়ের উপর থেকে ট্যাংক বিধ্বংসী নিজেদের তৈরী পেট্রোল বোমা নিয়ে কয়েকজন মুজাহীদ "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি তুলে নিচে লাফিয়ে পড়লো। দেখতে দেখতে অনেকগুলো ট্যাংক ধ্বংস হলো। একটির শরীরের উপর অন্যটি উঠে বিকট শব্দে দুটি ট্যাংক বিধ্বস্ত হলো। অনেকগুলো সাজোয়া যানেও আগুন ধরে গেল।

পাহাড়ের গুহা হতে, বালুর গর্ত হতে "আল্লাহ আকবার" ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। রাইফেল, মেশিনগানের শব্দ ছাড়িয়ে 'আল্লাহু আকবার" ধ্বনিতে সমস্ত কুফর কেঁপে উঠলো। জীবনকে বাজি রেখে মুজাহীদ বাহিনী একের পর এক শত্রু হত্যা করে চল্লো।

জেনারেল জারাজায়ানী এ দৃশ্য দেখে কামান বাহিনীকে গোলা নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। ট্যাংক বাহিনী ও অগ্রসরমান সৈন্যরা এরূপ বাধার সম্মুখীন হবে তিনি তা বুঝতেই পারেননি।

নির্দেশ পাবার সাথে সাথে বারো চৌদ্দটি কামান হতে এক সাথে গোলা নিক্ষেপ শুরু হলো। মুজাহীদগণ এবার প্রমাদ গনলেন। কামানের গোলার আঘাতে পাহাড়ের শীর্ষে ও গুহাতে অবস্থানরত মুজাহীদগণ বেশিক্ষণ টিকতে পারলো না। "আল্লাহু আকবর" ধ্বনি থেমে গেল। ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান তর তাজা মুজাহীদদের দেহ খন্ড-বিখন্ড হয়ে গেল। বালুর গর্তে লুকিয়ে থাকা মুজাহীদগণ ট্যাংকের নীচে চাপা পড়েই মারা গেল অধিক। যারা উপরে উঠলো তাদের দেহ ঝাঁঝড়া হয়ে গেল। জেনারেল জারাজায়ানী চুরুটে জোরে দুটি টান দিয়ে অট্টহাসিতে

ফেটে পড়লেন। তারপর বেশ উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলেন– ওমর মুখতার! দেখ এবার মজা। তোমার আজ নিস্তার নাই। হেঃ হেঃ হে! এর পর নিকটে দাঁড়ান এক মেজরকে কাছে ডেকে বললেন।

ঃ দেখছ মেজর– পিঁপড়ের ন্যায় কিভাবে শেষ হয়ে গেল ওমর বাহিনী। আমার ধারণা ওরা একটিও বেঁচে নেই।

ঃ আমারও তাই ধারণা স্যার।

ঃ চলো– যেয়ে দেখি ওমরের মৃত দেহটি পাওয়া যায় কিনা।

ঃ চলুন স্যার।

জেনারেল জারাজায়ানির গাড়ি ব্রিজ পার হয়ে এপারে এলো।

ঃ শিহাব।

ঃ বলুন সাইয়্যেদ।

ঃ এখন কী করতে হবে আমাদের? দুটি প্রতিরোধই শেষ হয়ে গেল।

ঃ এবার শেষ প্রতিরোধ ব্যবহার করতে হবে।

ঃ কিন্তু আর একটি সমস্যা দেখা দিবে এক্ষুণি।

ঃ কি?

ঃ তৃতীয় প্রতিরোধের সম্মুখীন হলে জেনারেল জারাজায়ানী বিমান বাহিনী তলব করবে।

ঃ বিমান বিধ্বংসী কোন অস্ত্রতো আমাদের নাই।

ঃ নাই ঠিক-ই। তবে নিকট থেকে মেশিনগানের গুলিতে বিমান ধ্বংস করা সম্ভব।

ঃ তা হলে এখন কি করবো?

ঃ ওরা যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে সেভাবেই হতে দাও। আর তুমি ওদিকটায় যাও। মাইন বাহিনীর নেতৃত্ব দিবে তুমি। আমার নির্দেশ পাবার সাথে সাথে ওদের সমস্ত সৈন্য ও গাড়িগুলো ধ্বংস করে দিবে। তবে খুব চালাকির সাথে ওদেরকে আমাদের মাইন ফিল্ড এলাকাতে সমবেত করতে হবে।

ঃ ঠিক আছে সাইয়্যেদ।

ঃ যাও, ওদিকে গিয়ে সব কিছু ঠিক আছে কিনা দেখ।

ঃ আমি এদিকটা দেখছি।

ঃ হাদের।

শিহাববিন কাশিম মাইন ফিল্ড কন্ট্রোল এরিয়াতে চলে গেলেন।

একের পর এক কামানের গোলা এসে মুজাহীদদের ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করে দিল। কোন ক্রমেই ইতালী বাহিনীর অগ্রযাত্রায় বাধা দিতে পারলো না। গুপ্ত অবস্থান থেকে পালিয়ে যেতেও সক্ষম হলো না। দু'একজন যারা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলো তারা মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ারে ঝাঁঝরা হয়ে গেল।

ফাহিম সাসূনী ও কিলানী কাশশাফ পাহাড়ের শীর্ষে অবস্থান করছিল। মেশিনগানের সাহায্যে তারা বেশ কজন ইতালী সৈন্যকে ঘায়েল করল। ওরা আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে ইতালী বাহিনীর উপর গুলি বর্ষণ করে যাচ্ছিল। কিন্তু কখন একটি কামানের গোলা ওদের দুজনের মাঝখানে এসে পড়লো তা তারা বুঝতে পারলো না। বুঝতে পারার আগেই তাদের দেহ টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

মুজাহীদ বাহিনীর প্রতিরোধ আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে এলো। ট্যাংক বাহিনীর সহায়তায় ইতালী সৈন্যরা অগ্রসর হয়ে তন্নতন্ন করে ওমর মুখতারকে খুঁজতে লাগ-লো। কিন্তু জীবিত কোন মুজাহীদ তারা পেল না। তবে মৃত দেহগুলো পুনরায় গুলির আঘাত খাওয়া থেকে রেহাই পেল না।

ঃ কি করছেন আপনি? – এক ক্যাপটেন, এক মেজরকে জিজ্ঞাসা করলো।– মৃতদেহের উপর গুলি ছোঁড়া অমানবিক। আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী।

ঃ আমাকে জ্ঞান দিয়ো না। তুমিও গুলি ছোঁড়।

ঃ অসম্ভব।

ঃ আমার নির্দেশ এটি।

ঃ দুঃখিত। আমি একজন মানুষ। মানবিক গুণগুলো এখনো কিছু অবশিষ্ট আছে আমার। মেজর চোখ দুটো বড় বড় করে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকালো একবার। তারপর মেশিনগান দিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকা মুজাহীদদের লাশের উপর গুলি বর্ষণ শুরু করলো। তার নির্দেশে অন্য সৈন্যরাও শুরু করলো। প্রতিবাদী ক্যাপটেন দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। তার হৃদয় এই দৃশ্য দেখে কেঁদে উঠলো।

মানুষ হয়ে মানুষের প্রতি একি দুর্ব্যবহার!!

উপুড় হয়ে পড়ে থাকা লাশগুলো পায়ের আঘাতে চিৎ করে ওরা ওমর মুখ-তারের লাশ খুঁজতে লাগলো। তাদের ধারণা দীর্ঘ এই তিন চার ঘন্টার যুদ্ধে কোন মুজাহিদের বেঁচে থাকা বা পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে জারাজায়ানির ধা-রণা তাই। তিনি চুরুটে টান দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। বিজয়ের আনন্দে তিনি আত্মহারা।

ঃ বেচারা ওমর মুখতার। যুদ্ধ কাকে বলে দেখ এবার। অনেক জ্বালিয়েছ তুমি। অফিসার।

– দূরে দাঁড়ান এক অফিসারকে ডাকলেন তিনি।

ঃ স্যার।

ঃ ওমরের মৃত দেহ পাওয়া গেছে?

ঃ না স্যার।

ঃ পাওয়া যায়নি!

ঃ প্রতিটি লাশ ভালো করে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

ঃ কুইক। ওই জানোয়ারের মুন্ডুটা আমি আগে দেখতে চাই।

ঃ ওকে স্যার।

হঠাৎ এভাবে আক্রমণ হবে ইতালী সৈন্যরা তা বুঝতে পারেনি। বালির ঢিবির অপর প্রান্তে লুকিয়ে থাকা কিছু মুজাহীদ আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে ঘোড়ায় চড়ে ক্ষিপ্র গতিতে ইতালী বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। অপ্রস্তত হয়ে পড়লো ইতালী বাহিনী। কিন্ত কিছুক্ষণমাত্র। ট্যাংক বাহিনীর মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ারে অগ্রসরমান মুজাহীদ বাহিনী ঘোড়ার উপর হতে লাশ হয়ে নীচে পড়ে গেল। তাদের ঘোড়াগুলোও জীবিত রইল না। প্রতিবাদী সেই ক্যাপ্টেন একটি গাছের আড়ালে বসে মুজাহীদদের অগ্রযাত্রা দেখছিল আর সুযোগ বুঝে গুলি করছিল। তার দশ পনের গজ দূরে অবস্থান করছিল সেই মেজর। কথার অবাধ্য হওয়া ক্যাপ্টেনের উপর হতে তখনো তার রাগ কমেনি। দুজন মৃত মুজাহিদের লাশের উপর দাঁড়িয়ে সে কোমর হতে পিস্তল বের করল। তারপর পিছন দিক হতে ক্যাপটেনকে গুলি করলো। এক দুই করে খুব ঠাণ্ডা মাথায় তিনটি গুলি করলো মেজর। ক্যাপ্টেনের দেহ লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে ক্যাপটেন দেখলো কোন মুজাহিদের গুলিতে সে মৃত্যুবরণ করছে না। মৃত্যুবরণ করছে তার-ই বাহি-নীর এক অফিসারের গুলিতে।

দুটি লাশের নিচে পড়ে থাকা এক মুজাহিদের দেহে তখনো প্রাণ ছিল। কিন্তু নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল সে। এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখলো সে। মেজর তার থেকে মাত্র পাঁচ গজ দূরে অবস্থান করছে। খুব ক্ষিপ্তগতিতে সে নিজের উপর পড়ে থাকা লাশ দুটো সরিয়ে পাশেই পড়ে থাকা রাইফেল হাতে উঠিয়ে নিল। তারপর প্রথমে মেজরকে গুলি করলো। এরপর তার পাশে দাঁড়ান আরো দুজন সৈন্যকে। পাশেই দাঁড়ান এক ইতালী সৈন্যের মেশিনগান গর্জে উঠলো হঠাৎ। সে মেশিনগানের ম্যাগাজিনে অবশিষ্ট গুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ট্রিগারে আঙুল ধরে রাখলো। মুজাহিদের মাথার মগজ ছিটকে বেরিয়ে গেল।

ঃ শুয়ারের বাচ্চা-। কর্কশ কণ্ঠে গালি দিল ইতালী সৈন্যটি। তারপর নতুন ম্যাগাজিন ভরে মুজাহীদদের লাশ লক্ষ্য করে সে একের পর গুলি চালিয়ে যেতে লাগলো। অফিসারের মৃত্যু তার মাথায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

ট্যাংক বাহিনীর সহায়তায় সাধারণ সৈন্য ও সাজোয়া বাহিনী ক্রমেই অগ্রসর হচ্ছে। অগ্রসর হতে হতে তারা এক স্থান এসে থামলো। সামনে পূর্ব পশ্চিমে লম্বা ছোট একটি টীলা। তার ও পাশে মরুভূমি। কুফর-এর মুজাহীদ বাহিনীর পুরা ঘাটি তারা তছনছ করে দিয়েছে। অবশিষ্ট শুধু সামনের টীলাটি। কিন্তু সেখানে কোন মুজাহীদ আছে বলে মনে হয় না। তা হলে ওমর মুখতার গেল কোথায়?- সম্মুখভাগে নেতৃত্ব দেওয়া অফিসার ভাবতে থাকে। - পালিয়ে গেছে এমনতো মনে হয় না। আর পালাবেও বা কী করে। পালানোর কোন পথ তো রাখা হয়নি। মৃত কোন মুজাহিদের মধ্যে তার লাশও পাওয়া যায়নি। তা হলে!!

কোমরের দূরবীণ চোখে ধরে প্রথমে মরুর দিকে দৃষ্টি তুলে ধরলো অফিসার। না, একটি প্রাণীকেও ভেগে যেতে দেখা যাচ্ছে না। তা হলে? তা হলে সামনের টী-লাতে কি লুকিয়ে আছে সে!! টীলাটিকে ঘিরে ফেলতে হবে এক্ষুণি। দূরবীণ নামিয়ে অফিসার সৈন্যদের নির্দেশ দিতে যাচ্ছিলেন সবেমাত্র। হঠাৎ বিস্ফোরণ শুরু হলো তারা সেখানে অবস্থান করছে ঠিক সেখানে।

ওমর মুখতারের ইশারা পেয়ে শিহাব বিন কাশিমের নেতৃত্বে মুজাহীদ বাহিনী একের পর এক লুকিয়ে রাখা মাইনের সুইচ অন করতে শুরু করলো। ট্যাংক ও সাঁজোয়া বাহিনীগুলোও এক এক করে উল্টাতে শুরু করলো। দু'একটিতে আগুন ধরে গেল। কোথা হতে কি হচ্ছে বুঝে উঠার আগেই প্রায় সমস্ত সাঁজোয়া যান ও ট্যাংকগুলো ধ্বংস হলো। নেতৃত্ব দেওয়া অফিসার বুঝতে পারলো মুজাহীদদের পুতে রাখা মাইন ফিল্ডের মধ্যে ঢুকে পড়েছে তারা।

ঃ এ এলাকা থেকে পালাও। চিৎকার ছাড়লেন অফিসার। কিন্তু বিস্ফোরণের শব্দের মাঝে তার সে চিৎকার কোন সৈনিকের কানে পৌছাল না। প্রাণে বেঁচে যাওয়া সৈন্যরা পঙ্গপালের ন্যায় দিক-বিদিক পালাতে শুরু করলো।

বিজয়ের আনন্দে আত্মহারা জারাজায়ানী এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তার মুখের হাসি কর্পূরের ন্যায় উবে গেল। দূরে দাঁড়িয়ে তিনি তার সৈন্যদের পালানো ও মৃত্যুর দৃশ্য দেখতে থাকলেন। তার মুখের চুরুট কখন মা-টিতে পড়ে গেছে তা টের পাননি। চোখে বিস্ময় তার । একি দেখছেন তিনি!! তার দীর্ঘ দিনে অর্জিত যুদ্ধ বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা সামান্য এক স্কুল মাষ্টারের যুদ্ধ বিদ্যার নিকট পরাস্ত হলো! শাবাশ ওমর মুখতার। মনের অজান্তেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো–

ঃ সত্যই ওমর মুখতার, তুমি একজন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। জারাজায়ানি এবার বিমান বাহিনী তলব করলেন। খুব শক্তিশালী বোমাবহন করে উড়ে এলো দশ পনেরটি বোমারু বিমান। খুব নিচু দিয়ে উড়ে গিয়ে তারা বোমাবর্ষণ শুরু করলো। সাথে মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ার। দেখতে দেখতে সমস্ত এলাকা আগুনের কুণ্ডলী ও ধোঁয়ায় ভরে গেল।

মুজাহীদ তথা ওমর মুখতারের শেষ ঘাঁটি "কুফর" ধ্বংস হলো। ওমর মুখতার সহ মাত্র তেরজন মুজাহীদ প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হলেন সেখান হতে।

কুফর দখল করে জেনারেল জারাজায়ানির যে ক্ষতি সাধিত হয়েছিল তার হিসাব দেওয়া মুশকিল। তবে একথা বলা যায়, তারা যে সৈন্য, অস্ত্র ও সামরিক যান নিয়ে এই আক্রমণ শুরু করেছিল তার দুই তৃতীয়াংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

কুফর ইতালীয়দের পদানত হল।

ওমর মুখতার ও বেঁচে থাকা অন্য মুজাহীদদের নিরাপদ কোন ঠাঁই রইল না আর। ইতালীদের তাড়া খেয়ে ফিরতে লাগলো তারা। জারাজায়ানী মিসরের সীমান্ত একেবারে সীল করে দিলেন, যাতে ওমর মুখতার পালাতে না পারে। আজ হোক কাল হোক ধরা তাকে পড়তেই হবে।

২৪ জানুয়ারি ১৯৩১।

কুফরে অবস্থানরত ইতালীর সৈন্যদের আনন্দ ও কর্ম ব্যস্ততার শেষ নেই। রক্তে ধোয়া বালু ও লাশগুলো তারা ইতোমধ্যে সরিয়ে ফেলেছে। নুতনভাবে কুফরকে সাজিয়েছে তারা। মার্শাল জেনারেল বাদিলিউ আসছেন আজ। তিনি কুফর-এ আনুষ্ঠানিকভাবে ইতালীয় পতাকা উত্তোলন করবেন।

ঠিক সকাল দশটায় ত্রিপলী থেকে তিনি বিমান যোগে কুফর-এ গিয়ে অবতরণ করলেন। তোপ ধ্বনি দিয়ে তাকে স্বাগত জানান হলো। ব্যান্ড বাহিনী বাজনা বাজিয়ে স্বাগত জানাল। বিভিন্ন রং-এর সংমিশ্রণে সুন্দর একটি মঞ্চ বানান হয়েছে। জেনারেল বাদিলিউ ধীরে ধীরে সেই মঞ্চে গিয়ে উঠলেন। তার পিছে জারাজায়ানী। সমবেত সৈন্যদেরকে তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আনুষ্ঠানিকভাবে ইতালীর পতাকা উত্তোলন করলেন। সৈন্যরা আনন্দে মেতে উঠলো। হাতে মদের বোতল নিয়ে তারা গানের সুরে সুরে নাচে মেতে উঠলো।

বাদিলিউ ফিরে গেলেন।

ওই মঞ্চেই আনা হলো পঞ্চাশ জন বন্দিকে। তার মধ্যে বেশ ক'জন কিশোর ও প্রৌঢ়। এই পঞ্চাশ জনের মধ্য হতে বার জনকে নির্বাচন করা হলো। বেদীর অদূরে পিঠ মোড়া দিয়ে তাদের হাত বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। তাদের বিশ হাত দূরে একটি মেশিনগান ফিট করা হয়েছে। অফিসারের নির্দেশে বাজনা বেজে উঠলো। আবার শুরু হল সৈন্যদের মদ হাতে উগ্র নাচানাচি। ইতালীর অনেক মেয়েও এই নাচে যোগ দিয়েছে। তাদের বেশভূষা সব আপত্তিজনক। সৈন্যরা তাদের নিয়েও মাতামাতি করছে। হঠাৎ অফিসারের কণ্ঠ বেজে উঠলো–

ঃ ফায়ার।

ঠা ঠা করে মেশিনগান গর্জে উঠলো। বারটি তাজা প্রাণ পড়ে গেল মাটিতে। রক্তের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে কুফরের মাটি। বাজনার তাল আরো দ্রুত হলো। সৈন্য ও মেয়েদের নাচের তালও বেড়ে গেল। বারটি প্রাণের তাজা রক্তের গন্ধ তাদের আনন্দের মাদকতা আরো বাড়িয়ে দিল।

## ॥ ১৬ ॥

কুফর পদানত হবার পর সেখানে শিশু, মহিলা ও বৃদ্ধছাড়া কোন কিশোর ও যুবককে পাওয়া গেল না। তিন দিন ধরে ইতালীয় সৈন্যরা ইতিহাসের জঘন্যতম পশু প্রবৃত্তির মহড়া চালালো কুফর ও তার আশপাশ এলাকায়।

৪ জানুয়ারী ১৯৩১ সাল।

ভীত সন্ত্রস্ত কুফরবাসীর ঘুম ভাংলো উৎকণ্ঠা ও ভয়ের মধ্যে। না জানি দিনের আলো ফুটলে অসভ্য ইতালীরা তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করে! অনেকে রাতের

আঁধারে প্রাণ ও সম্মান বাঁচাতে পালিয়ে গেল। অনেকে ঘর ছেড়ে গুহা ও জঙ্গলে পালিয়ে রইল।

সূর্য তখনো দ্বি-প্রহর হয়নি। নাস্তাপর্ব শেষ করে ইতালী সৈন্যরা উন্মাদনার খেলায় মেতে উঠলো। তাদের আগমন সংবাদ পেয়ে যে যেখানে পারলো আত্মগোপন করলো।

শারিবা শাতিলার বয়স আঠার। তার মায়ের বয়স চল্লিশ। বড় ভাই ওমর মুখতারের দলে যোগ দিয়েছে। পিতা অনেক আগেই শহীদ হয়েছেন। ভাই জীবিত না মৃত এখনো তারা জানতে পারেনি। ছোট ভাই নিহান শাতিলার বয়স দশ। শারিবা অতিশয় সুন্দরী। সুন্দর তার মা-ও। শরীরের গঠন দেখে তার বয়স ২৭/২৮ মনে হয়। সৈন্যদের গ্রামে প্রবেশের সংবাদ শুনে তারা ঘরের মধ্যে আত্মগোপন করলো। বুক ভয়ে দুরু দুরু কাঁপছে। এই বুঝি ঘরের দরজায় লাথি পড়লো। এই বুঝি ইতালী সৈন্যরা ওদেরকে কুরে কুরে খাওয়া শুরু করলো।

ঃ মা, আমার খুব ভয় করছে। নিহান কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো।

ঃ আল্লাহকে ডাকো বাবা।

ঃ আমার কথা শুনলেন না মা। রাতে ভেগে যাওয়া উচিত ছিল আমাদের। শারিবা মন্তব্য করলো।

ঃ কোথায় ভেগে যাবি মা?

ঃ অনেকে গেছে।

ঃ ওরা কেউ পালাতে পারবে না। ইতালী সৈন্যরা ওদের ধরে আনবে।

ঃ কিন্তু এখন কি হবে?

ঃ জানি না।

ঃ মৃত্যু ছাড়া কোন পথ নাই মা! ওদের হাতে ইজ্জত দেবার থেকে মৃত্যুই শ্রেয় মা। আমি সেই পথ বেছে নিচ্ছি।

শারিবা ক্ষিপ্রগতিতে পাশে পড়ে থাকা খঞ্জর উঠিয়ে নিলো। নিহান দৌড়ে এসে তার আপুকে জড়িয়ে ধরলো।

ঃ আপু তুমি আত্মহত্যা করো না।

ঃ একি করছিস শারিবা!! মা মন্তব্য করলেন।

ঃ তাছাড়া পথ কি বল। তোমার সামনে যখন ওরা আমার দেহটাকে কুরে কুরে খাবে– তুমি তখন তা সহ্য করতে পারবে মা? তোমাকেও তো রেহাই দিবে না ওরা। মেয়ে হয়েও সে দৃশ্য আমাকে দেখতে হবে।

ঃ চুপ কর মা! ওদের হাত-পা জড়িয়ে ধরে আমি অনুরোধ করবো।

ঃ মা, ওরা বন্যপশু! দয়া-মায়া– সৃষ্টিকর্তার ভয়, অন্যায়বোধ ওদের মধ্যে নাই। তারপর কথা হল আমরা পরাজিত। পরাজিতের উপর যে কোন আচরণ করা ওদের কাছে অন্যায় নয়।

ঃ তাই যদি হয়, তবে দে– খঞ্জরটি আমার হাতে। আমিই আমার প্রাণটি আগে বিসর্জন দিই। মা– শারিবার হাত থেকে খঞ্জরটি কেড়ে নিতে গেল।

ঃ না মা! সন্তান হয়ে আমার চোখের সামনে তোমার মৃত্যু আমি দেখতে পারবো না। নিহান খঞ্জরটি নিয়ে এক পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলো।

ঃ মা, মাগো, তুমি চলে গেলে আমাদের কি হবে? আমরা কোথায় যাব– মা মাগো, কথা বল।

মা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠলেন। এমন সময় দরজায় পদাঘাত পড়লো। একবার দু'বার তিনবার।

ওদের কান্না থেমে গেল। ভয়ে মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এখন কি হবে! আল্লাহ! তুমি আমাদের রক্ষা কর।

দরজার কপাট ভেঙে গেল। চারজন ইতালী সৈন্য ঘরে প্রবেশ করলো। শারিবা ও তার মা নিজেদের শরীর কাপড়ের আড়ালে লুকাল। সৈন্যরা পরস্পর চোখের ভাষায় কথা বলে নিল। তারপর শারিবা ও তার মায়ের মুখের কাপড় সরিয়ে ফেললো।

ঃ ওয়াহ! এযে খাসা মাল! একজন সৈন্য মন্তব্য করলো।

ঃ বড়ই মজা হবে। এতো সুন্দরী মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি। অন্যজন মন্তব্য করলো। শারিবার মা একজন সৈন্যের পা জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠলো–

ঃ তোমাদের পায়ে পড়ি। আমাদের কোন ক্ষতি করো না। এক লাথি দিয়ে সৈন্যটি তাকে দূরে সরিয়ে দিল। তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। অন্যদিকে জোর করে শারিবার শরীর থেকে এক সৈন্য কাপড় সরাতে শুরু করেছে। মা ছুটে এসে-সে সৈন্যের পা জড়িয়ে ধরলো।

ঃ দোহাই তোমাদের। আমার মেয়ের কোন ক্ষতি করো না।

ঃ কোন ক্ষতি করবো না তাকে। আমরা শুধু তার পেটের মধ্যে একটি বাচ্চার বীজ ঢুকিয়ে দিবো। তোমাকেও দিবো। এতে কান্না কাটির কি আছে!

অন্য আর একজন সৈন্য এসে মায়ের শরীর থেকেও কাপড় খুলতে শুরু করলো। এবার নিহান এসে ওদের বাধা দিলো। জোরে ধাক্কা দিয়ে এক সৈন্যকে ফেলে দিলো সে। সৈন্যটি ওঠে রক্তচক্ষু ধারণ করলো। তারপর সজোরে একটি চপেটাঘাত করলো। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল নিহান শাতিলা।

একটু পরে তার জ্ঞান ফিরে এলো। তারপর যে দৃশ্য সে দেখলো, তাতে দশ বছরের ওই শিশুর মাথায়ও আগুন চড়ে গেল। পাশাপাশি মা-বোনের ইজ্জত লুটা কোন ভাই দেখতে পারে না। ভাল করে চার দিকে একবার দেখে নিলো নিহান। অন্য দু'জন দরজায় দাঁড়িয়ে আছে পিছন ফিরে। মোক্ষম সুযোগ এটি। ক্ষিপ্র গতিতে খঞ্জর উঠিয়ে নিয়ে সে দু'পশুকে পরপর কয়টি আঘাত করলো, ওদের

যন্ত্রণা কাতর চিৎকারে অন্য দুজন ঘুরে দাঁড়াল। নিহান তখন ওদের দিকে খঞ্জর উঠিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। দু'পা এগোনোর পর তার গতি থেমে গেল। এক ঝাঁক বুলেট তার সমস্ত দেহটাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিলো।

দেহের উপর থেকে যন্ত্রণা কাতর পশুকে ফেলে দিয়ে বিবস্ত্রা মা ছেলেকে জড়িয়ে ধরলো। রক্তে তার শরীর ভেসে যাচ্ছে।

ঃ বাবা নিহান, তুই একি করলি বাবা! কথা বল বাবা। কথা বল।...

নিহানের দেহ নিস্তেজ হয়ে গেল। আহত একজন সৈন্য অতি কষ্টে পাশে রাখা রাইফেল উঁচু করে মাকে গুলি করতে গেল। অন্যজন তাকে বাধা দিলো।

ঃ না, ও কাজটি করো না। দেখছো না কি জিনিস! ওকে আদর করে মারতে হবে। গুলির আঘাতে নয়।

এরপর অন্য দু'জন পশুরূপ ধারণ করলো। কুরে কুরে মা-মেয়ের শরীরকে খেয়ে উলঙ্গ অবস্থায় তাদেরকে এক গাছের সাথে বেঁধে রাখলো।

সমস্ত গ্রামবাসীকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হলো। একদিকে মহিলারা। অন্য দিকে বৃদ্ধ ও শিশুরা। সকলের সামনে উলঙ্গ অবস্থায় বাধা রয়েছে শারিবা শাতিলা ও তার মা। লজ্জায়, অপমানে, ক্ষোভে তাদের মাটির সাথে মিশে যেতে ইচ্ছা করছে।

প্রতিটি ঘর হতে সংরক্ষিত খাদ্য-সামগ্রী ও অন্যান্য দ্রব্যাদি গ্রামবাসীর সামনে জড় করা হল। তার মধ্য হতে দামী দামী জিনিসগুলো সরিয়ে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হল। এরপর জড় হয়ে বসে থাকা শিশু ও বৃদ্ধদের লক্ষ্য করে পাঁচটি মেশিনগান এক সাথে গর্জে উঠলো। চোখের সামনে আপন সন্তান, পিতা ও দাদাদের মৃত্যু দেখলো সকলে। তারা চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। কিন্তু তাদের সে কান্নার শব্দ ইতালী সৈন্যদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করলো না। এক দিকে আগুনের দাউদাউ শব্দ, অন্যদিকে সৈন্যদের আনন্দ উল্লাস। মুহূর্তের মধ্যে অসংখ্য কচি কচি তাজা প্রাণ ঝরে গেল বৃন্ত হতে অথচ একটু আগেও তারা কথা বলছিল। মা মা বলে ডাকছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ইতালীর সভ্য (?) মানুষগুলো তাদের সে 'মা' ডাককে চিরতরে মুখ থেকে কেড়ে নিল।

এরপর গ্রামের সকল ছাগল, ভেড়া ও দুম্বার সাথে সমস্ত মহিলাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। পশুগুলো তাদের পেটের ক্ষুধার শিকার হলো। আর মহিলারা হলো যৌন ক্ষুধার শিকার। কিন্তু শারিবা শাতিলা ও তার মায়ের ভাগ্যে কি জুটলো!

স্বাভাবিক নিয়মে যা জোটে তাই জুটলো তাদের কপালে। অনাহারে রোদে শুকিয়ে তাদের মৃত্যু ঘটলো।

তিনদিন ধরে আশ পাশের সমস্ত গ্রামে এভাবে অত্যাচারের হোলি খেলা চালাল ইতালী সৈন্যরা। মসজিদগুলো কামানের গোলা মেরে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলো। মুছহাফ (কোরআন) শরীফগুলো জমা করে তা তারা রান্না-বান্নার খড়ি হিসাবে

ব্যবহার করলো। ধর্মীয় বই পুস্তক ঘোড়ার আস্তাবলে ফেলে দেয়া হলো। হাজার হাজার মানুষকে কাটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা উত্তপ্ত রোদের বন্দীখানাতে অর্ধাহারে ও অনাহারে রাখা হলো। সন্ধ্যার পরে সেই বন্দী শিবিরের মহিলাদের নিয়ে প্রতিদিন আনন্দ ফুর্তির আসর জমানো হলো। ইতোমধ্যে অনেক মহিলা গর্ভধারণ করলো। অনেকে রোগ-শোকে, বিনা চিকিৎসায় মারা গেল। শতকরা ৯০% শিশু মারা গেল বিভিন্ন অসুখে। অনেকে অন্ধ হয়ে পড়ে রইল চোখের অসুখে। কিন্তু তারপরও জারাজায়ানী থেমে রইল না। তার নির্দেশে এক মাস ধরে প্রতি দিন বন্দী শিবির হতে বেছে বেছে ত্রিশ জন লোককে ধরে এনে ফাঁসি দেয়া হলো। যারা ভেগে গেল তাদের কপালে জুটলো আরো ভোগান্তি। বোমারু বিমানগুলো খুঁজে খুঁজে তাদের উপর বোমা বর্ষণ শুরু করলো। মরুর উত্তপ্ত বালুতে তাদের দেহ পড়ে রইল। কোন কুফরবাসী বেঁচে যাওয়া সম্পর্কে তার মন্তব্য ছিল—

"শত্রুর একজনকে ক্ষমা করে দিয়ে নিজেদের মধ্যে তাকে অবস্থান করতে দেয়া এক হাজারজন ভেগে যাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া শত্রু হতে মারাত্মক"!

জারাজায়ানির কাছে সংবাদ পৌছাল প্রায় দু'শজন সম্ভ্রান্ত ঘরের সুন্দরী মহিলা রাতের আঁধারে পালিয়ে গেছে। জারাজায়ানী যে কোন ভাবেই হোক না কেন, তাদেরকে বন্দী করে আনার নির্দেশ দিলো। নির্দেশ পেয়ে একদল সৈন্য রওনা হলো মরুভূমির পানে। তারা ঘোড়া এবং উটের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে অগ্রসর হতে শুরু করলো। দীর্ঘ তিন ঘন্টা অনুসরণ করে ইতালী সৈন্যরা তাদের দেখা পেল। প্রাথমিক অত্যাচারের পর তাদেরকে বন্দী করে কুফরে আনা হল। এই দু'শ মহিলাদের মধ্যে সত্তরজন অতিশয় ধার্মিক ও সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা, জায়া, জননী ছিল। তারা এতো পর্দানশীন ছিল যে, সূর্য পর্যন্ত কখনো তাদের চেহারা দেখেনি। জারাজায়ানী তাদের চেহারা দেখলো, দেখলো তাদের দেহের লোভনীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ইতালী অফিসারদের পশুবৃত্তি নিবৃত্তের জন্য তাদেরকে রেখে দেয়া হলো। একের পর এক জোর করে তাদের সম্ভ্রম ও ইজ্জত নষ্ট করা হল। জোর করে মদ পান করান হলো। অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় তাদের নাচের সাথী করা হল। লজ্জা, অপমান ও ক্ষোভে তাদের কয়েকজন আত্মহত্যার পথ বেছে নিল। বাকিদের সে সুযোগ দেয়া হলো না। এদের মধ্যে অনেকেই অল্পদিনে গর্ভবতী হয়ে পড়লো। জন্ম দিলো ইতালীয় অবৈধ সন্তান। অথচ হয়ত তাদের অনেকের স্বামী বেঁচে আছে, অনেকে কুমারী।

এমনি এক অষ্টাদশী কুমারী মেয়ে সিলানী কাশ্‌শাফ। অটুট স্বাস্থ্য। কাঁচা রোদের মত গায়ের রং। আঙুরের ডাসার মত তাজা পুষ্ট যৌবন। অনন্যা সুন্দরী সিলানী। সিলানী ছিল অত্যন্ত মেধাবী। মাত্র সাত বছর বয়সে পবিত্র কোরআন মুখস্থ করেছে। পিতার তত্ত্বাবধানে হাদীস, কোরআন, আকাঈদ, ফিক্‌হ ইত্যাদি বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্ব অর্জন করেছে। তার পিতা কুফরের বিখ্যাত একজন আলেম। এক মেজর তাকে বেছে নিল আনন্দ ফুর্তি করার জন্য।

## ॥ ১৭ ॥

হালকা কুয়াশার আবরণে ঢাকা পড়েছে চাঁদ। দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি জুড়ে নীরব বিস্তব্ধতা। ছোট্ট একটি কাফেলা এগিয়ে চলেছে মন্থর গতিতে। দূর থেকে মনে হচ্ছে মরুর অথৈ পাথারে ছোট্ট একটি নৌকা যেন এগিয়ে যাচ্ছে। তারা এগিয়ে যাচ্ছে আর মৃদু স্বরে কথা বলছে। কথা বলছে তারা চোখের নিদ্রাকে তাড়ানোর জন্য।

চারটি উটে চার জন আরোহী। সমান্তরাল গতিতে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। তিনজন আরব দেশের নাগরিক। অন্য জন ইউরোপীয়। নাম লিউপোলড ওয়াইস। অবশ্য এটি তার ইসলাম পূর্ব নাম। বর্তমান নাম মোহাম্মদ আসাদ। পূর্বে তিনি ইহুদি ছিলেন, ছিলেন ইসলাম বিদ্বেষী। ইসলামের ক্ষতির জন্য অনেক কাজ করেছেন। এখন মুসলমান। কাজ করছেন ইসলামের খেদমতের জন্য। তিনি মক্কা হতে ছুটে এসেছেন লিবিয়ার ভয় সংকুল এই মরুতে। সায়্যেদ আহমদ এর একটি মেসেজ ওমর মুখতারের নিকট পৌছানোর জন্য তার এই দুঃসাহসীক অভিযান।

ঃ ভাই খলিল। আর কতদূরে?

ঃ আরো ঘন্টা খানেক লাগবে ওয়াদি আল ম্রার ইদারাতে পৌছাতে। তার আগে পানির কোন ব্যবস্থা নাই।

ঃ ওখানে পৌছাতে আমাদের সকাল হয়ে যাবে। অন্য সাথী আবদুর রহমান মন্তব্য করলো।

ঃ সেখানে আত্মগোপন করার জায়গা আছেত?

ঃ না, নেই।

ঃ তা হলে?

ঃ আরো দু'ঘন্টার মত গেলে আমরা লুকানোর মত পাথুরে নীচু ভূমি পাব।

ঃ ততক্ষণেতো অনেক বেলা হয়ে যাবে?

ঃ খুব বেশি হবে না। বেলা এক প্রহর হবে।

কাফেলা যখন ইঁদারার কাছে পৌছাল পূর্ব আকাশ তখন সাদা হয়ে গেছে। ওরা ইঁদারা হতে পানি উঠাল। উটগুলোকে পানি পান করাল। নিজেদের মোশক ভরলো। নিজেরা তৃষ্ণা মিটাল। হাত মুখ ধুয়ে অজু সেরে সালাত আদায় করলো।

ঃ এদিকে ইতালীদের চৌকি কতদূরে আবদুর রহমান? মোহাম্মদ আসাদ জানতে চাইলেন।

ঃ বেশ দূরে। তেমন ভয় নাই সৈন্যদের। তবে একটি ভয় আছে?

ঃ কিসের ভয়?

ঃ বিমানের।

ঃ ওরা কি পাহারা দেয়?

ঃ হ্যা। তবে এতো সকালে হয়ত আসবেনা।

কিছু বিশ্রাম ও নাস্তা সেরে তারা আবার যাত্রা শুরু করলো। মরুর বুক চিরে পূব আকাশে তখন লাল সূর্য উকি দিতে শুরু করেছে। বেশ লাগছে পথ চলতে। ঝিরি ঝিরি নির্মল হাওয়া বইছে। ঘুম ক্লান্ত মরু শরীরের অলসতা ঝেড়ে সবে সতেজ হয়ে উঠছে। এখন তার মেজাজ ভালো আছে। কিন্তু রোদ বাড়ার সাথে সাথে তার মেজাজটাও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। তখন তার বুকে কোন মানব সন্তান পা রেখে বিচরণ করলে তাকে সহজে ছাড়বেনা। হঠাৎ সকল নীরবতা ভেঙে চুরমার করে দিল উড়োজাহাজের অশুভ গগন বিদারী শব্দ। একক পাইলট চালিত ছোট একটি বিমান তাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। কেউ মানসিক ভাবে প্রস্তুত ছিলো না এমন একটি অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার জন্য। বিমানটি কিছুদূর গিয়ে বাঁক নিয়ে ক্রমেই নীচু হয়ে কাফেলার দিকে ধেয়ে আসতে লাগলো। পালানোর কোন পথ খুঁজে পেলনা তারা। সমতল বালূ ছাড়া এখানে কোন উঁচু নীচু ঢিবিও নাই। অগত্যা উট থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে পড়লো তারা। বিমানটি খুব নিকটে চলে এসেছে। শুরু হলো মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ার এবং বোমা নিক্ষেপ।

ঃ শুয়ে পড়ো–শুয়ে পড়ো।–চিৎকার ছুড়লেন মোহাম্মদ আসাদ। মাটির উপর শুয়ে পড়ো। মরার মত শুয়ে পড়ো। নড়াচড়া করোনা। সবাই শুয়ে পড়লেও খলিল মরার ভান করে শুয়ে থাকলো না। একটি পাথরে মাথা রেখে চিত হলে শুয়ে পড়লো। তারপর হাটুর উপর রাইফেল রেখে হাঙ্গরের মত ধেয়ে আসা বিমানকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে লাগলো। এ্যালো পাথাড়ী গুলি নয়। বেশ লক্ষ্য করেই গুলি ছুঁড়তে লাগলো। অত্যন্ত সাহসী খলিল। কিন্তু এতা সাহসী তা জানা ছিলো না মোহাম্মদ আসাদের। খলিলের গুলি ছুঁড়াতে কাজ হলো। সম্ভবতঃ বিমানের গায়ে তার ছোঁড়া কোনগুলি লেগে থাকবে। নচেৎ রনে ভংগ দিয়ে বিমানটি ঊর্ধ্ব মুখি হয়ে পালিয়ে যেত না। অনেক উপর থেকে একটি চক্কর দিয়ে জাগবুব এর দিকে চলে গেল বিমান।

ঃ কাপুরুষ ইতালীর কুত্তার বাচ্চা! – বেশ উচ্চস্বরে বলতে থাকে খলিল।– আমাদের মারতে চায়, কিন্তু নিজেরা মরতে চায়না। কাপুষের দল।

নিজেরা আহত না হলেও আবদুর রহমানের উটটি মারা গেল বোমার আঘাতে। মরা উটের থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস খুলে নিয়ে তারা যাত্রা শুরু করলো। দীর্ঘ তিনদিন পথ চলে কাফেলা জাবালে আখদার-এর জুনিপার বনাঞ্চলে প্রবেশ করলো। এখানে ওমর মুখতারের অনুগামী অনেক মুজাহীদের সাথে তাদের সাক্ষাত হলো। একটু বিশ্রাম ও ক্লান্ত উটগুলো বদল করে ঘোড়া নিয়ে তারা আবার যাত্রা শুরু করলো। তবে এবার মরুভূমি দিয়ে নয়। পাহাড়ী শিলাময় মালভূমি দিয়ে।

আরো ক'দিন পথ চলার পর তারা পৌঁছাল ওয়াদি আত্ তায়াবান-এ। গভীর অরণ্যে ঢাকা ওয়াদি আত্ তাবান। মোহাম্মদ আসাদ চারিদিকটা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলেন। জায়গাটি বেশ নিরাপদ মনে হলো। তবুও সাবধানের মার নাই। একটি খাদের মধ্যে ঘোড়াগুলোকে লুকিয়ে রাখা হলো।

ঃ খুব ঠান্ডা পড়ছে আব্দুল্লাহ।

ঃ হ্যা, হাত পা হিম হয়ে আসছে।

ঃ অন্ধকারও ঘুট-ঘুটে।

ঃ ঠিক বলেছেন।

ঃ নক্ষত্র ও চাঁদ দেখা যাচ্ছেনা।

ঃ এখানে সূর্যের আলোও পৌঁছেনা।

ঃ একটু আগুন জ্বালান যায় না, আব্দুল্লাহ?

ঃ না, নিরাপদ নয়। আঃ রহমান কথা বলে।

ঃ আমাদের মশকগুলি খালি হয়ে গেছে। –খলিল মন্তব্য করলো।

ঃ অল্প দূরেই বু-সফাইয়ার ইঁদারা। ওখান থেকে পানি আনা যায়।

ঃ কিন্তু নিকটেই তো চৌকি? আব্দুল্লাহ মন্তব্য করলো।

ঃ ওই কাপুরুষ কুত্তারা রাতে তাদের দেওয়ালের বাইরে আসার সুযোগ পাবেনা। চলো আবদুর রহমান। আমরা মশকগুলো ভরে আনি। সায়্যেদ ওমর আসার এখনো অনেক দেরী।

শিলাময় পাথরে ঘোড়ার খুর লেগে যাতে শব্দ না হয় সেজন্য তারা ঘোড়ার পায়ে কাপড় জড়িয়ে নিল। ওরা দু'জন পানি আনতে চলে গেল। এদিকে গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন ওমর মুখতার। ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। একটু একটু করে আগ্রাসী ইতালিরা সমস্ত দেশ দখল করে নিচ্ছে। শেষ ঘাঁটি ছিল কুফর। সেটিও হাত ছাড়া হলো। ওরা অমানুষিক অত্যাচার করছে জনগণের উপর। কুফর দখলের পর অত্যাচারের মাত্রা আরো বেড়ে গেছে। ওরা পশু-নরপশু।–ওমর মুখতার নড়ে বসলেন। এতোক্ষণ চোখ বোজা ছিল। চোখ মেললেন তিনি। পাশে বসে আছেন আল-আতাই বিস। মাঘারিয়া কবিলার সর্দার তিনি। ওমর মুখতারের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন। তিনি তার গোত্রের লোকজন নিয়ে অবিচল বাধা দিয়ে যাচ্ছেন ইতালী নর পশুদের। মিসর থেকে সাহায্য আনার কাজে তার দল ভীষণ সাহসিকতার সাথে কাজ করছে। সমুদ্র উপকূল থেকে জাগবুবের নিকট দিয়ে মিসর সীমান্ত বরাবর ইতালীরা যে কাটা তারের বেড়া দিয়েছে, তার দলের লোকেরা তা ডিঙিয়ে মিসর থেকে রসদ ও অস্ত্র আনছে।

ঃ সিদি ওমর।

ওমর মুখতার উত্তর দিলেন না। মাথা উঠিয়ে তাকালেন।

ঃ আপনার শরীরটা কি খুব খারাপ লাগছে?

ঃ না, শরীর ঠিক আছে। নড়ে বসলেন তিনি।–মনটা ভাল না। ভাবছি–।

ঃ এভাবে আর বেশিদিন চলা যাবে না।

ঃ অনেক পুরান কথা আতাইবিস্।

ঃ শেষ ঘাঁটি কুফ্‌র হাতছাড়া হলো।

ঃ কুফর! হ্যা আতাই বিস, কুফর হাত ছাড়া হয়ে ক্ষতি হলো আমাদের।

ঃ আবু কারাইম বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন। নব্বই উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি।

ঃ হ্যা, আল্লাহ তাকে শক্তি দিন। তার নেতৃত্বে জুবাইয়া এখনো মরণপণ যুদ্ধ করে যাচ্ছে। যা মনে হচ্ছে, তিনিও বেশি দিন টিকতে পারবেন না।

ঃ থাক ওসব কথা। এখন আমাদের উঠতে হবে। সিদি আহমদের ওফ্‌দ (প্রতিনিধি) আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

ঃ হ্যা, চলুন দেখি সায়্যেদ আহম্মেদ কি সংবাদ পাঠালেন।

ঘুট ঘুটে আঁধার চারিদিকে। ঝি ঝি পোকা অবিরাম ডেকে চলেছে। মাঝে মধ্যে দু' একটি নিশাচর পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। ঠান্ডায় প্রায় জমে যেতে বসেছেন মোহাম্মদ আসাদ ও আব্দুল্লাহ। তারা অপেক্ষার প্রহর গণছেন। কখন আসবেন–মরুসিংহ সিদি ওমর!! মোহাম্মদ আসাদের মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তাঁকে দেখার জন্য। নিশ্চয় বিশাল বাহু বিশিষ্ট এক কর্মঠ সুপুরুষ হবেন তিনি। বয়স তাকে হয়ত কাবু করতে পারেনি। মজবুত হাত পা। অটুট স্বাস্থ্য। উন্নত নাসিকা। ঈগলের মত তীক্ষ্ণ সতর্ক চোখ। –হঠাৎ চিন্তায় ছেদ পড়লো তার। জঙ্গলের গাছের শাখা মর্মর শব্দ করে উঠলো। সাথে নুড়ি পাথরের উপর স্যান্ডেলের সুক্ষ্ম মোলায়েম শব্দ ভেসে এলো। সচকিত হলে বসলেন আসাদ। আব্দুল্লাহ মুহূর্তে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে পড়ে। গহীন আঁধারে তার তীক্ষ্ণ চোখ মেলে ধরে শব্দের উৎসের পানে। হঠাৎ শেয়ালের কান্নার মত একটি আওয়াজ ভেসে এলো। আবদুর রহমান তার দু'হাত গোল করে মুখের সামনে ধরে অনুরূপ আওয়াজ তুলে প্রতি উত্তর দিল। অন্ধকারের বুক চিরে দু'টি ছায়ামূর্তি তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। হাতে আগ্নেয়াস্ত্র তাদের দিকে তাক করা। অস্ত্র ফেলে তারা হাত উঁচু করে দাঁড়াল।

ঃ রিহাবিল্লাহ (আল্লাহর পথ) এক ছায়া মূর্তির মুখ হতে শব্দ দুটি বের হলো।

ঃ "লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহ"–আল্লাহ ছাড়া কারো কোন ক্ষমতা নেই, কোন শক্তি নেই।–আঃ রহমান উত্তর দিলো।

তাদের দু'জনের এক জনের পরনে লিবিয়ার বদ্দুদের (গ্রাম্য লোক) পোশাক। অন্যজনের স্বাভাবিক। একজন আঃ রহমানের দিকে এগিয়ে এসে বেশ আন্তরিকতার সাথে মোছাহাফা করলো। বুঝা গেল ওদের মধ্যে পূর্ব পরিচিতি রয়েছে।

ঃ ইনি মোহাম্মদ আসাদ।–আঃ রহমান পরিচয় করিয়ে দিলেন। সিদি আহমেদ এর বার্তা বাহক। ওরা দু'জন একে একে তাঁর সাথে মুসাফা করে বল্লেন ঃ "ফি আমানিল্লাহ" আল্লাহ আপনার সহায় হোন। সিদি ওমর আসছেন।

মিনিট দশেক অতীত হলো। কোন সাড়া শব্দ নাই। প্রহর গণছে সবাই। খুবই কড়া সতর্কতা। ইতালী চৌকি বেশি দূরে নয়। কোন প্রকার একটু জানাজানি হলে রেহাই নাই কারো। পঙ্গপালের ন্যায় হন্যে হয়ে জঙ্গল ঘিরে ধরবে তারা। উৎকীর্ণ সবাই। হঠাৎ জুনিপার ঝেঁপের মধ্যে পাতা মাড়ানোর শব্দ ভেসে এলো। তিনটি ছায়ামূর্তি তিন দিক হতে বেরিয়ে এলো। হাতে উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র।

ঃ যে যে অবস্থায় আছো সেভাবে দাঁড়িয়ে থাক। একটু নড়লেই গুলি করবো।-অন্ধকার ভেদ করে এক জনের কণ্ঠ গম গম করে বেজে উঠলো-। পূর্বে আসা দু'জনের এক জম কথা বললো। ওরা দ্বিতীয় বাক্য না বাড়িয়ে যেভাবে অন্ধকার হতে বেরিয়ে এসেছিল, সেভাবে আবার অরণ্যের আঁধারে মিলিয়ে গেল। নেতার নিরাপত্তার জন্য তাদের এই সতর্কতা।

কিছুক্ষণ পরে ছোট্ট একটি ঘোড়া দেখা গেল। বনের আঁধার চিরে-ঝোপ-জঙ্গল ও গাছের ফোঁক-ফাকড় দিয়ে ঘোড়াটি এগিয়ে এলো। ঘোড়ার পিঠে বসা সিংহ-মরু সিংহ ওমর মুখতার। তাঁর দুপাশে দুজন করে মুজাহীদ। হাতে রাইফেল। পেছনেও বেশ কজন মুজাহীদ। মোহাম্মদ আসাদের সামনে এসে ঘোড়াটি দাঁড়াল। একজন ওমর মুখতারকে ঘোড়া হতে নামতে সাহায্য করলো। কারণ, আঘাতের ক্ষত ও ব্যাথ্যা এখনো কমেনি। দশ দিন আগে তিনি আহত হয়েছেন। মোহাম্মদ আসাদ অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন এই আগন্তুকের দিকে। তার কাল্পনিক চেহারার সাথে সামনে দাঁড়ান এই বীর সিংহের চেহারার কোন মিল নেই। একজন মাঝারী সাইজের লোক। মজবুত গঠন। বরফের মত খাটো সাদা চাপ দাড়ি। চোখ দুটি কোটরের গভীরে লুকান। চেহারার গাথুনি দেখে বুঝা যাচ্ছে তার চোখ দুটি স্ফূরিত থাকত সদা সর্বদা। কিন্তু এখন সেখানে যন্ত্রণা ও সাহস ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই।

ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম।-তিনি সালাম দিলেন প্রথম।

ঃ ওয়াআলাই কুমুস্ সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ।-মোহাম্মদ আসাদ প্রতি উত্তর দিলেন।

ঃ আহ্‌লান্ ওয়া সাহ্‌লান-সু স্বাগতম।-খুব দরদ ভরা কণ্ঠে তিনি অভ্যর্থনা জানালেন। কিন্তু এরই মাঝে তিনি কোটরাগত চক্ষুর তীক্ষ্নতা দিয়ে তার আপাদ মস্তক পর্যবেক্ষণ করে নিলেন।

মাটির উপর একটি কম্বল বিছিয়ে দেওয়া হলো, ওমর মুখতার তার উপর বসে পড়লেন। আঃ রহমান ভক্তিভরে তাঁর হাতে চুমো খেল। তারপর তার অনুমতি নিয়ে হাল্কা আলো জ্বালানো কাজে নিজেকে ব্যাপৃত করলো। মোহাম্মদ আসাদ অতি যত্নে সংরক্ষিত সুদূর মক্কা থেকে বয়ে আনা সায়্যেদ অহমদের চিঠিটি ওমর মুখতারের হাতে দিলেন। তিনি ল্যাম্পের অল্প আলোতে যত্নের সাথে সেটি পড়লেন। তারপর সেটি মাথার উপর রাখলেন। অতঃপর স্মিত হেসে মোহাম্মদ আসাদের দিকে তাকালেন।

ঃ বৎস! সায়্যেদ আহমেদ–আল্লাহ্ তাকে দীর্ঘ জীবন দান করুন, তোমার সম্পর্কে অনেক ভাল কথা বলেছেন। তুমি আমাদের সাহায্য করতে চাও। এজন্য তোমাকে আন্তরিক মোবারকবাদ। কিন্তু বৎস! সাহায্য একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছ থেকে আসতে পারে না। আমাদের বরাদ্দের সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আ–

ঃ কিন্তু জনাব–কথার মাঝে কথা বলতে শুরু করেন মোহাম্মদ আসাদ, সায়্যেদ আহমদ যে পরিকল্পনা উদ্ভাবন করেছেন–তা কি নতুন দিগন্তের সূচনা বয়ে আনতে পারে না? মিসর থেকে যদি অস্ত্র, ঔষধ ও রসদ সরবরাহ করা যায় এবং কুফর কে কেন্দ্র করে এগোনো যায়, তবে কি ইতালীদের প্রতিহত করা সম্ভব নয়? ওমর মুখতারের ওষ্ঠে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় অসহায় তিক্ত হাসি। অনেক বেদনা লুকান সে হাসির গভীরে।

ঃ কুফ্র!!–একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। বৎস! আমরা তা পনের দিন আগেই হারিয়েছি। কুফ্র এখন ইতালীদের দখলে।

ঃ হায় খোদা! একি শুনছি আমি!–মোহাম্মদ আসাদ খবর শুনে বিমূঢ় হয়ে পড়েন। দীর্ঘ ক'মাস ধরে সায়্যেদ আহমেদের সাথে বসে যে পরিকল্পনা তিনি করেছেন, তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল, কেন এমন হলো খোদা!! যে কুফ্রকে প্রধান কেন্দ্র করে ইতালীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক যুদ্ধ পরিচালনার বিস্তারিত নক্শা তিনি তৈরি করেছিলেন, তা এভাবে বিনষ্ট হয়ে গেল কেন!!

ঃ কুফর পতন হয়েছে!! কিভাবে পতন হল? ওমর মুখতার এ জিজ্ঞাসার উত্তর দিলেন না। ক্লান্ত ভঙ্গিতে নড়ে বসে তাঁর একজন সহচরকে কাছে ডাকলেন।

ঃ এ বলবে কুফর পতনের করুণ কাহিনী। কুফ্র থেকে যে ক'জন লোক প্রাণে বেঁচে গেছে তাদের মধ্যে এ একজন। গতকালই সে এখানে পৌঁছেছে। লোকটি আমাদের সামনে এসে বসলো। তারপর আস্তে আস্তে বলতে শুরু করলো। তার গলায় কোনরূপ আবেগের কাঁপুনি ছিল না। লোকটি বলে চলেছে–

....তিনদিক থেকে আক্রমণ করেছিল ওরা। সাথে ছিল কামান, মেশিনগান, ট্যাংক ও বিমান। ওদের বিমানগুলো খুব নিচু হতে বোমা বর্ষণ করে সব শেষ করে দেয়। আমরা প্রাণপণ যুদ্ধ করি। কিন্তু শেষ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ওদের কাছে আমরা পরাভূত হই। আমরা মাত্র তিনচার জন প্রাণে বেঁচে যাই।

মোহাম্মদ আসাদ কিছু জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে থেমে যান। লোকটি ঢোক গিলে আবার শুরু করে।–আমি একটি পাম বাগিচার মধ্যে আত্মগোপন করি। খুবই করুণ ও হৃদয় বিদারক সে সব দৃশ্য। সারা রাত আমি মহিলাদের যন্ত্রণা কাতর চিৎকার শুনতে পাই। পশুগুলো রাতভর মা-বোনদের উপর পাশবিক নির্যাতন করে। পরদন এক বৃদ্ধা আমাকে কিছু খাদ্য এনে দেয়।–

ঃ তারপর–। মোহাম্মদ আসাদের চোখ ভারী হয়ে এলো।

ঃ সেই বৃদ্ধা আমাকে বলে–যে সব লোক বেঁচে গেছে ইতালী জেনারেল তাদের সবাইকে সায়্যেদ মাহদীর কবরের পাশে জড়ো করে। তারপর সে সব পাম গাছ কেটে ফেলার নির্দেশ দেয়। ধ্বংস করে দেয় ইঁদারাগুলো। সায়্যেদ আহমদের গ্রন্থাগারের সব বই পুস্তক জ্বালিয়ে দেয়। এ পর্যন্ত বলে লোকটি থামলো। –মোহাম্মদ আসাদের চোখে নীরব জিজ্ঞাসা–তারপর। কথা বলতে ভুলে গেছেন তিনি।

পর দিনের ঘটনা। এলাকার সমস্ত আলেম উলামাদেরকে একত্রিত করা হয়। তারপর তাদের হাত পা বেঁধে উড়ো জাহাজে উঠান হয়। উড়োজাহাজ অনেক উপরে উঠলে সেখান থেকে তাদেরকে মাটিতে নিক্ষেপ করা হয়। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে হয়ে যায় তাদের দেহ। রাতে তারা আবার পাশবিকতায় মেতে ওঠে। আমার লুকানো স্থান থেকে সারারাত মহিলাদের চিৎকার, কাকুতি ও কান্নার শব্দ শুনতে পাই। সেই সাথে শুনতে পাই হায়েনাদের কুৎসিত অট্টহাসি রাইফেলের শব্দ। এরপর–

ঃ প্লিজ! আর না। মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ নীরব থাকেন মোহাম্মদ আসাদ। ওমর মুখতার লোকটিকে কাছে টেনে নিয়ে স্নেহের হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর বললেন ঃ

ঃ বৎস! বুঝতেই পারছো–আমরা আমাদের জন্য বরাদ্দ সময়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি?

কিছু বলার জন্য মোহাম্মদ আসাদ মুখ তুললেন। কিন্তু ওমর মুখতার আবার বলতে শুরু করলেন–হয়ত তার মনের কথা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ঃ

ঃ তবুও আমরা লড়ে যাচ্ছি। লড়ে যাচ্ছি স্বাধীনতার জন্য; লড়ছি আমাদের ধর্মের নির্দেশ পালনে। আমরা লড়ে যাবো যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণ থাকবে। কারণ,"ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন"–আমরা আল্লাহরই, আর তারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। যতটুকু পেরেছি–আমাদের স্ত্রী-কন্যাদের মিসরে পাঠিয়ে দিয়েছি, কিছুটা হলেও ওদের চিন্তা মুক্ত থেকে আমরা যুদ্ধ করতে পারবো।

জঙ্গলের উপরে আকাশে বিমানের শব্দ শোনা যায়। হঠাৎ একজন অনুচর স্বয়ংক্রিয়ভাবে আগুনের উপর বালু ছিটিয়ে দিল। নিরাপত্তার প্রতি কড়া দৃষ্টি তাদের। রাতেও ইতালী বিমানগুলো নিচে আলো ফেলে পাহারা দিচ্ছে।

ঃ কিন্তু, সায়্যেদ ওমর! এখনো আপনার ও আপনার অনুচরদের জন্য একটি পথ খোলা রয়েছে। তাহলো মিসরে চলে যাওয়া। সেখানে অনেক মুহাজির সমবেত হয়েছে। তাদেরকে একত্রিত করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এক শক্তিশালী বাহিনী গড়ে তোলা কঠিন নয়। তাই আপাতত সংগ্রাম কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখা ভাল নয় কি?

ঃ না, এ আর সম্ভব নয়। ওটি সম্ভব ছিল পনের বছর আগে। অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি সায়্যেদ আহমদ তুর্কীদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশদের উপর আক্রমণ করার পূর্বে।

মোহাম্মদ আসাদ এবার নিশ্চুপ মেরে যান। তিনিও জানেন সায়্যেদ আহ্‌মদের ব্রিটিশদের উপর আক্রমণ ছিল অত্যন্ত একটি ভুল সিদ্ধান্ত। তিনি সেটি না করলে হয়ত মুখত্তার বাহিনীর এরূপ পরিস্থিতি হতো না আজ।

ঃ আমরা এখন মিসর গেলে–একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে থাকেন ওমর মুখতার আর ফিরে আসতে পারবো না। তাছাড়া কি করে আমরা আমাদের নিরীহ লোকজনদেরকে আল্লাহর দুশমনদের নিকট রেখে যাই?

ঃ সায়্যেদ ওমর। সায়্যিদ ইদ্রিস কি বলেন? তারও কি একই মত?

ঃ তিনি একজন সুবোধ নিরিহ মানুষ। এ ধরনের সংগ্রাম করার মত সাহস তাঁর নেই। সব থেকে বড় কথা আমাদের সামনে আর সময় নেই। একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। অনেকটা অজান্তেই বোধ হয়।

কথা বাড়েনা আর। উঠার প্রস্তুতি নেয় সকলে। ইতালী সামরিক চৌকি আবু স্কাইয়ার খুব নিকটে। এখানে বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়। যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে।

সকলে রওনা হলো। কিছুদূর অগ্রসর হতেই ঝোপ-জঙ্গলের আড়াল হতে অনেকগুলি কালো ছায়ামূর্তি তাদের সাথে যোগ দিলো। সতর্কতার মার নেই। তাছাড়া কেউ ওমর মুখতারের সন্ধান পেলেও তাঁর পর্যন্ত পৌঁছান সহজ নয়। আঁধারে আত্মগোপন করা এই সমস্ত নিবেদিত প্রাণ মুজাহিদগণকে ডিঙিয়ে আসা আর মরণ ফাঁদে পা দেওয়া একই কথা।

পূর্ব আকাশ তখন সাদা হয়ে উঠেছে। ওমর মুখতার তার আস্তানায় ফিরে এলেন। একটি গভীর সংকীর্ণ গিরিখাদের মধ্যে এই আস্তানা। দু'শরও বেশি মুজাহিদ সেখানে। ফজরের সালাত আদায় করে মোহাম্মদ আসাদ আস্তানা ও তার কর্মীদেরকে খুব গভীর ভাবে লক্ষ্য করলেন। সকলেই খুব কর্মঠ। নামাজ সেরেই সকলে কাজে লেগে পড়লো। কেউ রান্নার কাজে, কেহ অস্ত্র পরিস্কার করার কাজে, দু'জন স্ত্রীলোক দেখে মোহাম্মদ আসাদের মনে কৌতূহল জন্মালো, ওমর মুখতার তার কৌতূহল বুঝতে পারলেন। তাই বল্লেন,–

ঃ আমাদের দু'টি বোন। ওরা আর সকল স্ত্রীলোকের সাথে মিসরে যেতে রাজি হয়নি। আমাদের সাথেই থাকে। আপনজন বলতে ওদের তেমন কেউ নাই। ইতালীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সকলে শহীদ হয়েছেন। ওরা মা-বেটি, আমাদের খুব সহযোগিতা করে। দেখছেন না, এ কেমন দক্ষ হাতে ঘোড়ার জিন লাগাচ্ছে।

ঃ হ্যা, অপূর্ব এ দৃশ্য। কিন্তু জনাব, আমার মাথা হতে একটি চিন্তা এখনো তাড়াতে পারছিনা।

ঃ কি?

ঃ আপনাদের কাছে নিয়মিত রসদ পাঠান যায় কিভাবে সেই চিন্তা। বিকল্প একটি পথ আমি খুঁজে পেয়েছি।

ঃ কি সে পথ?

ঃ যে পথে আমি এসেছি।

ঃ হ্যা, সেটি সম্ভব। কিন্তু তা হয়ত বেশি দিন করা যাবে না।

ঃ যতদিন এবং যতটুকু পারা যায়। আমি মিসরে ফিরে গিয়েই রসদ পাঠানোর সব ব্যবস্থা নিশ্চিত করছি।

ঃ আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন। আর সায়্যেদ আহমদের সাথে আপনার সাক্ষাত হলে আমার সালাম পৌছে দিবেন।

ঃ সেটি বলার অপেক্ষা রাখেনা জনাব। এ মুহূর্তে আরো একটা জিনিস আপনাদের বিশেষ প্রয়োজন ।

ঃ কি?

ঃ পরস্পরের মাঝে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।

ঃ ওই ঘোড়াই আমাদের সম্বল।

ঃ আমি বেতার যোগাযোগের কিছু যন্ত্রপাতিও পাঠিয়ে দিবো।

ঃ আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন।

ঃ দীর্ঘ ক'মাস ধরে সায়্যেদ আহমদের সাথে আমি অনেক পরিকল্পনা করেছি। সে পরিকল্পনার কেন্দ্র বিন্দু ছিল কুফর। কিন্তু তা যখন হলো না, তবুও যতদূর সম্ভব সেই পরিকল্পনার বিকল্পরূপ আমি দিতে সচেষ্ট হবো।

ঃ আল্লাহ আপনার সহায় হোন। আপনি কবে ফিরে যেতে চান।

ঃ আগামী কাল।

ঃ এখন একটু বিশ্রামের প্রয়োজন আপনার। আপনি বিশ্রাম করুন। আমি এখন একটি আক্রমণের প্ল্যান তৈরী করবো।

ঃ আপনারও বিশ্রামের প্রয়োজন।

হাসলেন ওমর মুখতার। করুন শুষ্ক হাসি।

ঃ আপনি বিশ্রাম নিন। অর্ধ রাতের পরেই আপনাকে যাত্রা করতে হবে। আমরা শেষ রাতে ওদের একটি চৌকি ধ্বংস করার জন্য আক্রমণ করবো ইনশাআল্লাহ।

## ॥ ১৮ ॥

শেষ ঘাঁটি কুফুর পতনের পর ওমর মুখতার সাময়িক হলেও দিশেহারা হয়ে পড়লেন। কিন্তু অকুতোভয়ী এই বীর দমে গেলেন না। যার রক্তের প্রতিটি বিন্দুতে রয়েছে জেহাদের নেশা, অন্যায়ের প্রতিবাদী প্রেরণা, তিনি কিভাবে দমে যাবেন? মুজাহিদের সামনে দুটি পথ খোলা থাকে। শহীদ নয় গাজী। পরাজয় বলে তো মুজাহীদদের জীবনে কিছু নাই।

তিনি সৈন্য সংগ্রহে নেমে পড়লেন। বিচ্ছিন্ন ছিটিয়ে থাকা মুজাহীদদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টায় ব্রতী হলেন। কুফর পদানত হয়েছে তাতে কি হয়েছে?

শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত তিনি ইতালী উপনিবেশী আগ্রাসী এই বর্বর বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাবেন।

জাবালে আখদারের গভীর অরণ্য। চল্লিশ জনের একটি ক্ষুদ্র মুজাহীদ দল। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে তারা ধীরে ধীরে সামনে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের অগ্রভাগে শুভ্রবসন বীর মুজাহীদ ওমর মুখতার। সামনেই জারিব উপত্যকা। অত্যন্ত বন্ধুর, ভয়সংকুল উপত্যকা এটি। উঁচু-নিচু পথ। কখনো ছোট ছোট নালা। খঞ্জর দিয়ে আগাছা কেটে অগ্রসর হতে হচ্ছে তাদের। অজগর ও বন্য হিংস্র জানোয়ারের ভয় রয়েছে। ওমর মুখতারের লক্ষ্য এই বন্ধুর ভয়সংকুল উপত্যকা পাড়ি দেয়া। ওপারে গিয়ে অন্য মুজাহীদদের অবস্থা তদারকি করতে হবে। তাদের মনে সাহস যোগাতে হবে। নতুন সৈন্য ও অস্ত্রের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঃ এই বন্ধুর পথ অতিক্রম করা খুব কঠিন সায়্যেদ ওমর। এক মুজাহীদ মন্তব্য করলো।

হাসলেন ওমর মুখতার। হাসলে তাঁকে সুন্দর লাগে। মূলতঃ তিনি হাসেন কম।

ঃ আমার বয়সের তিন ভাগের এক ভাগ তোমার বয়স। আমি তো পারছি। তুমি পারবে না?

ঃ পারবো না বলিনি। কিন্তু এভাবে আর কত দিন?

ঃ মুজাহীদের কাজ জেহাদ করা। ফলাফল আল্লাহর হাতে।

ঃ কিন্তু দিন দিন তো পরাজয়ই বরণ করছি বেশি।

ঃ আমরা যথেষ্ট জয় অর্জন করেছি। আর জয়-পরাজয় তো আল্লাহর হাতে।

ঃ আমরা কি তা হলে এভাবেই মরবো?

গতিতে ক্ষান্ত দিলেন ওমর মুখতার। বিশ ঊর্ধ্ব বয়স এই মুজাহিদের পানে গভীরভাবে তাকালেন। তারপর একটু উঁচু শব্দে বললেন।

ঃ মুজাহীদরা কখনো মরে না– সে কথা কি তুমি জান না জাযিরা? তুমি কি ভুলে গেছ আল্লাহর বাণীঃ

"আল্লাহর পথে যারা মৃত্যুবরণ করে তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত....।"

ঃ সায়্যেদ ওমর আমি বলতে চেয়ে–

ওমর মুখতার হাত উঠিয়ে বাধা দিলেন জাযিরাকে। তারপর বললেন–

ঃ বন্ধুরা, আসুন আমরা শপথ করি। একের পর এক আমরা খোদার পথে জীবন দিব– তবুও অসভ্য ইতালীদের হাতে স্বেচ্ছায় ধরা দিবো না। ওরা আমাদের ঘর-বাড়ি ভেঙে দিয়েছে, মা-বোনের ইজ্জত লুটেছে, আবালবৃদ্ধবনিতাকে পশুর মত হত্যা করেছে ও করছে। ওরা সমস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিয়েছে। পবিত্র মুছহাফকে তারা ঘোড়ার পায়ের নিচে ও চুলার লাকড়ি হিসাবে ব্যবহার করেছে.

মসজিদ ভেঙে মাটির সাথে গুঁড়িয়ে দিয়েছে– তার পরও কি আপনারা হাসান রিদার ন্যায় ওদের সাথে হাত মিলাবেন, না জেহাদ করবেন?

ঃ জেহাদ জেহাদ– চল্লিশ জন মুজাহিদের জেহাদ শব্দ জারিব উপত্যকার গাছ পালায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো।

দু'রাত অতিবাহিত হল। কিন্তু ওমর মুখতার জারিব উপত্যকা পাড়ি দিতে পারলেন না। ইতোমধ্যে চতুর্দিকে ছিটিয়ে ছড়িয়ে থাকা ইতালীর চরেরা ওমর মুখতারের জারিব উপত্যকা পাড়ি দেবার খবর জেনে গেল। তারা ত্বরিৎ ইতালী বাহিনীর নিকট খবর পৌঁছে দিল। আশপাশ হতে সকল সৈন্য একত্রিত করে ইতালী বাহিনী জারিব উপত্যকা ঘিরে ফেললো।

ওমর মুখতার বুঝতে পারলেন তারা শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছেন। পালাবার কোন পথ নাই। সামনে একটিই পথ খোলা, তা হল যুদ্ধ। তিনি মুজাহীদদের নিয়ে পরামর্শে বসলেন।

ঃ শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত আমরা। শান্তভাবে বলে যাচ্ছেন ওমর মুখতার। কোন ভাবান্তর নাই। দুশ্চিন্তারও ছাপ নাই চেহারায়। ওরা আমাদের খুব নিকটে পৌঁছে গেছে। পালাবার পথ নাই।

ঃ কী করবো আমরা? উঠতি বয়সী এক মুজাহীদ জানতে চাইল।

ঃ আপনারাই বলুন!

ঃ আক্রমণ! বয়স্ক এক মুজাহীদ বললেন।

ঃ হ্যাঁ, সেটিই একমাত্র পথ। কিন্তু...

ঃ বলুন।

ঃ ওরা চারদিক থেকে আমাদের উপর গুলি বর্ষণ করবে।

ঃ তা হলে আমরা গোল হয়ে ছড়িয়ে পড়ি।

ঃ হ্যাঁ, গোল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে যে যার মত সুযোগ বুঝে শত্রুকে ঘায়েল করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রত্যেককেই নিজ দায়িত্বে যুদ্ধ করতে হবে।

ঃ তাই হবে সায়্যেদ ওমর।

ঃ কিন্তু একটি কথা।

ঃ বলুন।

ঃ শত্রুদের এ ব্যূহ আমাদের ভেদ করতেই হবে।

ঃ ইনশাআল্লাহ– আমরা তা পারবো।

ঃ তবে সকলের মনে রাখতে হবে আমাদের লক্ষ্য হবে দক্ষিণ পশ্চিম দিক। আমরা ঐ দিক দিয়ে ওদের বূহ্য ভেদ করে বেরিয়ে যাব।

ঃ তাই হবে সায়্যেদ ওমর।

ঃ আল্লাহ আমাদের সহায়। যে যেখানে বসে আছেন সে সেদিকে ছড়িয়ে পড়ন। আল্লাহ হাফেজ।

চল্লিশ জন মুজাহীদ অসম সাহসিকতার সাথে নিজ দায়িত্বে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পুরো দুই দিন যুদ্ধ চললো। মুজাহীদদের রণকৌশল ও সাহসের কাছে ইতালী বাহিনী হার মানলো। ওদের অভেদ্য বূহ্যের বেষ্টনি ভেদ করে মুজাহীদ বাহিনী বেরিয়ে গেল। তবে চল্লিশজন থেকে তাদের সংখ্যা কমে পঁচিশ জনে এসে দাঁড়াল।

ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত ওমর মুখতার। পরিশ্রান্ত অন্য মুজাহীদরাও। ঘুম কাতর চোখ। অবসাদ ভরা দেহ। এখন দরকার একটু বিশ্রামের। ভয় কেটে গেছে। শত্রু বাহিনী এখন আর খুঁজে পাবে না।

ঘোড়াগুলোকে এক জায়গায় বাঁধলো তারা। তারপর বিশ্রামের জন্য বালুর উপর বসে পড়লো। অবসাদ ভরা চোখ বুঁজে আসতে চাইলো, হঠাৎ গুলির শব্দে তাদের সে ঘুমভাব কেটে গেল। কিছু বুঝে উঠার আগেই চারজন মুজাহিদের দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। টহল দেয়া এক ইতালী বাহিনীর সামনে পড়ে গেছে তারা। হঠাৎ এরূপ আক্রমণের জন্য মুজাহীদরা মোটেও প্রস্তুত ছিল না। পজিশন নিয়ে গুলি ছোঁড়ার পূর্বে আরো ক'জন মুজাহীদ লাশ হয়ে পড়ে গেল। শুরু হলো নতুনভাবে যুদ্ধ। কিন্তু বেশিক্ষণ যুদ্ধ করা সম্ভব হলো না মুজাহীদদের পক্ষে। একের পর এক তারা শহীদ হতে লাগল। ওমর মুখতার পালিয়ে যাওয়ার একটি পথ খুঁজে বের করলেন। ঘোড়ার জীনে পা দিয়ে দ্রুত ঘোড়াকে ছুটালেন সেদিকে। কিন্তু বেশি দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হলো না। ঘোড়া পড়ে গেল মাটিতে। এক ঝাঁক গুলি ঘোড়ার দেহকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। ওমর মুখতার ছিটকে পড়লেন বহু দূরে। কোমরে ও হাতে ব্যথা পেলেন প্রচণ্ডভাবে। কাঁধের রাইফেলও ছিটকে পড়লো বেশ ক'হাত দূরে। প্রথম একবার উঠে বসার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। দ্বিতীয়বারও ব্যর্থ হলেন। তৃতীয়বারের চেষ্টায় উঠে বসলেন। চুতুর্দিকে একবার দৃষ্টি ফিরিয়ে রাইফেল হাতে উঠালেন। যে স্থানে তিনি পড়ে গেছেন সেখানটা বেশ নীচু। তিনধারে কিঞ্চিত উঁচু বালুর ঢিবি।

উঠে দাঁড়ালেন ওমর মুখতার। বিশ পঁচিশ হাত দূরে দাঁড়ানো এক ইতালীয় অফিসার। তিনি রাইফেল তাক করলেন তার দিকে। কিন্তু গুলি ছোঁড়ার পূর্বেই চারিদিক থেকে অনেক সৈন্য এসে তাঁকে ঘিরে ধরলো। ওমর মুখতার অফিসারকে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলেন– সেই ক্যাপ্টেন এ, যাকে তিনি একদিন প্রাণে বাঁচিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য ওমর মুখতার জানতে পারেননি যে, এই ক্যাপ্টেনের অস্ত্র অনেক পূর্ব হতেই তার দিকে তাক করা ছিলো। তিনবার ট্রিগারে আঙুল দিয়ে আঙুল আবার সরিয়ে নিয়েছে সে। যখনই ট্রিগারে আঙুল দিয়েছে, তখনই সেদিনের সেই ওমর মুখতারের চেহারাটি বারবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। অবধারিত মৃত্যু থেকে তিনি সেদিন তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

তার সামরিক জীবনে সেদিনের মত ব্যবহার কোনদিন সে পায়নি। অমন ব্যবহার শুধু ওমর মুখতারের জন্যই শোভা পায়।

ক'জন সৈন্য এসে ওমর মুখতারের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিল।

ওমর মুখতার বন্দী হলেন।

## ॥ ১৯ ॥

১২ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ সাল। সন্ধ্যা সাতটা দশ। রোম থেকে একটি ট্রেন ছুটে চলেছে প্যারিসের দিকে। তার বিলাস বহুল একটি কম্পার্টমেন্টে জেনারেল জারাজায়ানী বসে আছেন। অবকাশ কাটাতে লিবিয়া থেকে তিনি দেশে ফিরেছেন। এখন যাচ্ছেন প্যারিসে। বেশ কিছুদিন থাকবেন সেখানে। মনটা একটু চাঙ্গা করে নেওয়া দরকার। লিবিয়ার উত্তপ্ত মরুতে ঘুরে ঘুরে দেহমন একেবারে রুক্ষ হয়ে গেছে। দীর্ঘদিন ধরে ওমর মুখতার নামের এক বৃদ্ধ স্কুল মাস্টার তাকে নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছেড়েছে। এখনো খাওয়াচ্ছে। তবে পূর্বের ন্যায় আর সুবিধাজনক স্থানে নেই সে। কুফর-এর পতনের পর তার পা থেকে বলতে গেলে মাটি সরে গেছে। ধরা পড়ার আগ পর্যন্ত তাকে বাকী জীবন পালিয়েই কাটাতে হবে। তবে সে বীর বটে। কি তার সাহস! কি তার রণ কৌশল! দীর্ঘ সামরিক জীবনে অর্জিত যত রণ কৌশল তার কৌশলের নিকট বারবার হার মেনেছে। আধুনিক রণ সম্ভারে সজ্জিত ইতালীর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সৈন্যরা তার হাতে বারবার মার খেয়েছে। অথচ তাদের বাহন বলতে ঘোড়া এবং অস্ত্র বলতে রাইফেল। ওমর মুখতার তোমাকে শত সহস্র সালাম। ধন্যবাদ তোমাকে।

চিন্তায় ছেদ পড়ল জারাজায়ানীর। শক্তিশালী বেতার যন্ত্রটি হঠাৎ বেজে উঠলো। সুইচ অন করে ওটিকে কানের কাছে ধরলেন। বিমূঢ় বিস্ময়ে কিছুক্ষণ উদাসভাবে চেয়ে রইলেন তিনি খবরটি শুনে। "ওমর মুখতার বন্দী হয়েছে"— ঠোঁটের কোনে হাসি ফুটে উঠলো তার। মনে মনে বলে উঠলেন– "ওমর মুখতার। তোমার খেল খতম"। তিনি যাত্রা বাতিল করে রোমে ফিরে এলেন।

১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ সালে ওমর মুখতার বন্দী হন। স্থানীয় সরকারী নেতৃবৃন্দের কাছে এ খবর পৌছালে তাদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তারা হেলিকপ্টার যোগে ছুটে গেলেন ঘটনাস্থলে। খবরের সত্যতা যাচাই করা দরকার। তারা এসে নিশ্চিত হলেন। অত্যন্ত কড়া নিরাপত্তার মধ্যে ওমর মুখতারকে প্রথমে মারছি ছুচাতে পাঠান হলো। সেখান থেকে সামরিক নৌযানে বেনগাজিতে।

বেনগাজির সমুদ্র বন্দরে মানুষের ঢল নেমেছে। আবালবৃদ্ধবনিতার মহাসম্মেলন যেন। সবাই ইতালীয় নাগরিক। বন্দী ওমর মুখতারকে দেখার জন্য তাদের এই সমাবেশ। সকলের মুখে হাসি। উঠতি বয়সের মেয়ে-ছেলেরা নেচে নেচে গান

গাচ্ছে। অনেক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধরা পর্যন্ত তাদের নাচের সাথে যোগ দিচ্ছে। মহাআনন্দের দিন তাদের আজ। ঘরে ঘরে ভাল খাবারের আয়োজন হচ্ছে। এ সবই হচ্ছে ওমর মুখতারের বন্দী হবার কারণে। ওমর মুখতার বন্দী হওয়া অর্থ পুরা লিবিয়া তাদের পদানত হওয়া।

অপেক্ষার শেষ হল এক সময়। সামরিক নৌযানটি এক সময় বন্দরে নোঙর করলো। সমবেত জনতার উল্লাস ধ্বনিতে বেনগাজির আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠলো। অসংখ্য সেনা সদস্য জনতাকে সামাল দিতে হিমসিম খাচ্ছে। কিছুতেই তারা উপচে পড়া জনতাকে পিছু হঠাতে পারছে না। তারা কিংবদন্তির সেই বীর যোদ্ধাকে এক নজর না দেখে ফিরবে না। ওমর মুখতারকে নামানো হলো যুদ্ধ জাহাজ হতে। হাতে পায়ে লোহার শৃংখল তাঁর। শক্ত মোটা লোহার শৃংখল। তিনি উপচে পড়া ইতালীয় জনতার দিকে একবার তাকালেন। সবার চেহারা হতে আমের মঞ্জুরী ঝরার মত অসংখ্য আনন্দ আর হাসি ঝরে পড়ছে। তাদের দুচোখে বিস্ময়! এই সেই কিংবদন্তির নায়ক ওমর মুখতার? যার নাম পর্যন্ত ইতালীয় সৈন্যদের মাঝে ত্রাসের সঞ্চার করত! এই সেই অসমসাহসী বীর!! মুখ ভরা সাদা চাপ দাড়ি। গায়ে ঢিলা-ঢোলা সাদা জামা। মাথায় সাদা পাগড়ি। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া এই বৃদ্ধই ওমর মুখতার!! কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার শেষ নেই জনতার চোখে-মুখে। অনেকে বিস্ময়ে বিমূঢ়! এই বৃদ্ধ কী করে যোদ্ধা হতে পারে? সে তো বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে। ঠিক মত হাঁটতে পর্যন্ত পারছে না। মরুর বিরূপ আবহাওয়াতে সে কিভাবে এক ঘাঁটি থেকে অন্য ঘাঁটিতে উল্কার বেগে ছুটে বেড়াত! এতো শক্তি এই বৃদ্ধ পেতো কোথায়? কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা শুধু জনতার মাঝে নয়। ইতালীর সৈন্য-অফিসারদের মাঝেও কৌতূহলের শেষ রইল না। তারা দীর্ঘদিন ওমর মুখতারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে ঠিকই। কিন্তু সেই কিংবদন্তির বীরের যে ছবি তাদের মনের মধ্যে ফুটে উঠেছিল, বাস্তবের সাথে সেই ছবির কোন মিল খুঁজে পেল না তারা। তারাও বিমূঢ় বিস্ময়ে ওমর মুখতারের দিকে চেয়ে রইল।

ওমর মুখতারকে জেলে রাখা হল। ১৩ সেপ্টেম্বর জারাজায়ানী ত্রিপলীতে এসে পৌঁছালেন। ১৪ সেপ্টেম্বর পৌঁছালেন বেনগাজিতে। বেনগাজিতে পৌঁছেই তিনি ১৫ সেপ্টেম্বর জরুরী আদালত আহ্বান করলেন। পরদিন আদালতে পাঠানোর পূর্বে জারাজায়ানী ওমর মুখতারকে তার কামরায় ডেকে পাঠালেন।

কড়া পাহারায় জেলখানা হতে তাঁকে জারাজায়ানীর কক্ষে আনা হল। ওমর মুখতারের হাতে পায়ে মোটা লোহার শিকল, শিকলের ভারে নুয়ে পড়েছেন তিনি। হাঁটতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। সর্বোপরি কোমরে ও হাতে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছেন।

জারাজায়ানীর ঘরের দরজার সামনে এসে গার্ডরা দরজা ফাঁক করে ওমর মুখতারকে ভিতরে ঠেলে দিল। ওমর মুখতার শিকলের ঝনঝন শব্দ করে তার

টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। জারাজায়ানী কিছু একটা লিখছিলেন। তিনি বুঝলেন এবং জানলেনও ওমর মুখতার তার সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু তিনি চোখ উঠালেন না। নিজের কাজে ব্যস্ত রইলেন। অনেকক্ষণ কেটে গেল এভাবে। এক সময় তিনি চোখ উঠালেন। তারপর ক্যাপ পরে উঠে দাঁড়ালেন। সেদিন তার পরনে ছিল কালো-সামরিক পোশাক। চোখাচোখি হলো ওমর মুখতারের সাথে। তিনি ক্যাপ খুলে আবার বসলেন। তারপর মুখ খুললেন

ঃ ওমর মুখতার! আপনি কেন ইতালী সরকারের বিরুদ্ধে এই কঠিন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন?

ঃ কারণ আমার ধর্ম আমাকে এভাবেই নির্দেশ দিয়েছে (বলা বাহুল্য একজন দোভাষীর মাধ্যমে আলোচনা চলছিল)।

ঃ আপনার কী উদ্দেশ্য ছিল এবং আপনি কী খুঁজে ফিরছিলেন?

ঃ আমি একজন মুজাহীদ এটিই যথেষ্ট। আমি জেহাদের কাজগুলো দীনের জন্যই করেছি– আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস রেখে। ফলাফলের কথা চিন্তা করে নয়।

ঃ আমি জেনেছি যে– আপনাদের কোরআন কাফেরদের সাথে জেহাদের নির্দেশ দিয়েছে। যদি পরিত্রাণ ও বিজয়ের আশা থাকে। অথচ এটিও নাকি বলা হয়েছে– সাধারণ মানুষের উপর কোন প্রকার কষ্ট দেয়া যাবে না। কোরআনে কি সত্যিই এটা বলা হয়েছে?

ঃ হ্যাঁ!

ঃ আপনি কেন যুদ্ধ করেছেন?

ঃ আমার ধর্মের নির্দেশ পালনে।

ঃ আপনি কেন শান্তি চুক্তি লঙ্ঘন করে আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছিলেন?

ঃ কারণ আমি অনেক মাস ধরে বাদিলিউকে লেখা আমার চিঠির জবাবের জন্য অপেক্ষা করেছিলাম। অথচ আমার চিঠির কোন জবাব দেয়া হয়নি।

ঃ সত্যিকারার্থে ওপের ও বিয়াটি নামের আমাদের দু'জন বৈমানিককে আপনি হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন?

ঃ নেতার উপরই সমস্ত দায়-দায়িত্বের ভার এসে পড়ে। আর যুদ্ধ তো যুদ্ধই।

ঃ আপনার কর্ম তৎপরতার অবসান হয়েছে। আপনি ইতালী সরকারের কাছে করুণা ভিক্ষা চাইতে পারেন।

ঃ তাই! কিন্তু আমি এ কথা বলতে চাই যে, আমি যখন বন্দী হয়েছিলাম তখন আমার রাইফেলে মাত্র ছয়টি গুলি ছিল। আর এটিও সম্ভব ছিল যারা আমাকে বন্দী করতে এসেছিল এই ছয়টি গুলি দিয়ে আমি ছয় জনকে হত্যা করতে পারতাম। অথবা তারা আমাকে হত্যা করতে পারত।

ঃ কিন্তু সেটি করেন নাই কেন?

ঃ কারণ আল্লাহর মীমাংসা ছিল সেটি। আমি একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ। আপনার উচিৎ আমাকে বসতে বলা।

এ কথায় লজ্জা পেলেন জারাজায়ানী। তিনি তার টেবিলের সামনের চেয়ারে ওমর মুখতারকে বসতে বললেন। বসার পর ওমর মুখতারের চেহারার উপর হতে কষ্টের চিহ্ন কিছুটা লাঘব হলো।

ঃ কতদিন পর্যন্ত পাহাড়ে বনে-বাঁদাড়ে পালিয়ে আপনি আমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারতেন?

ঃ অবশ্যই পারতাম! কিন্তু এখন তা বলে লাভ কী। আমি তো বন্দী। তবে শুনুন, আমরা প্রতিটি সদস্য শপথ করেছি– একের পর এক আমরা জীবন উৎসর্গ করবো, অথচ শত্রুর হাতে স্বেচ্ছায় কখনো আত্মসমর্পণ করবো না। আর একথা সত্য যে, আমিও স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিনি।

ঃ আমরা যদি পরস্পর বিশদ যোগাযোগ রক্ষা করতাম ও ভাবের আদান-প্রদান করতাম, তা হলে হয়ত একটা সুবিধাজনক স্থানে পৌঁছাতে পারতাম, যা আমাদের উভয়ের জন্য কল্যাণকর হত।

ঃ সেটি তো এখনো করা সম্ভব।

ঃ এখন সেটি আর সম্ভব নয়। কারণ আপনি এখন আমাদের হাতে বন্দী।
এরপর জারাজায়ানী তার টেবিলের ড্রয়ার খুললেন। তারপর সেখান থেকে একটি চশমা বের করলেন।

ঃ এটি কি আপনি চিনতে পারছেন?

ঃ হ্যাঁ, ওটি আমার চশমা। সানিয়ার যুদ্ধে ওটি আমি হারিয়ে ফেলি।

ঃ যেদিন এই চশমা আমার হস্তগত হয়, সেদিন আমি নিশ্চিত ছিলাম, আপনিও একদিন আমার হস্তগত হবেন।

ঃ সেটিই হয়ত লেখা ছিল। অনুগ্রহ করে চশমাটি আমাকে ফিরিয়ে দিন। ওটি ছাড়া আমি ভাল দেখতে পাই না। অবশ্য কী লাভ চশমা নিয়ে। আমি তো আপনাদের হাতে বন্দী এখন।

ঃ আপনি কি বিশ্বাস করেন, আল্লাহ আপনাকে এখনো আমাদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন, কারণ আপনি ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করছেন?

ঃ হ্যাঁ।

জারাজায়ানী গভীর দৃষ্টিতে সামনে বসা ওমর মুখতারের পানে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। আল্লাহর প্রতি কি অটল বিশ্বাস এই বীরের! কোন শক্তিতে সে এই বয়সে এই অসীম সাহসের কাজ করেছে!

ঃ আমি একজন বয়স্ক মানুষ। এ ধরনের লোহার বেড়ি পরানোর প্রয়োজন ছিল না। সালাত আদায়ের সময় হয়েছে। অনুগ্রহ করে খুলে দিলে খুশি হতাম।

জারাজায়ানীর চেহারায় কিঞ্চিত লজ্জার চিহ্ন ফুটে ওঠলো। তিনি কলিং বেলে টিপ দিলেন। দু'জন সৈন্য প্রবেশ করলো ঘরে।

ঃ ইনার হাত-পায়ের বন্ধন খুলে দাও।

ঃ সৈন্য দুজন দাঁড়িয়ে রইল। তাদের চোখে মুখে জিজ্ঞাসা।

ঃ দাও, খুলে দাও।

ঃ স্যার, আমা...! একজন সাহস করে মুখ খুললো।

ঃ তুমি খুলে দাও। সমস্ত দায়-দায়িত্ব আমার। সৈন্য দুজন তার হাত-পায়ের বেড়ি খুলে দিল।

ঃ ধন্যবাদ জেনারেল।

ঃ বলুন, আর কি করতে পারি আমি?

ঃ অজু করবো। যদি সম্ভব হয় একটু পানির ব্যবস্থা করলে খুশি হব।

ঃ একটি খোলা পাত্রে পানি আনা হল। ওমর মুখতার অজু সেরে নিজের গায়ের সাদা চাদর ফ্লোরে বিছিয়ে নামাজে দাঁড়ালেন।

জারাজায়ানী চেয়ে আছেন এক দৃষ্টে। পলক পড়ছে না। কি অভূতপূর্ব দৃশ্য! এ কী সুন্দর সিস্টেম মুসলমানদের উপাসনা করার। স্রষ্টার সম্মুখে নিজেকে উজাড় করে দেবার একি পদ্ধতি! একটু পরেই যে ব্যক্তিকে ফাঁসির নির্দেশ দেয়া হবে, তার মধ্যে কোন ভাবান্তর নাই। কি একাগ্রতার সাথে তিনি স্রষ্টার উপাসনা করছেন। ওমর মুখতার সালাম ফিরিয়ে আস্তিনের পকেট হতে মুছহাফ বের করলেন। তারপর অন্য পকেট হতে, সদ্য ফিরে পাওয়া চশমাটি চোখে পরলেন। খুবই পরিচিত ও বহু দিনের সাথী ছিল এই চশমাটি তাঁর। চশমাটিও যেন অনেকদিন পরে তার মনিবের চোখে উঠতে পেরে ধন্য হলো। ওমর মুখতার পবিত্র কোরআন খুললেন। তারপর মৃদু স্বরে পাঠ করতে লাগলেন।

"আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না, তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না। আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা এবং ধন সম্পদ, জীবন ও ফসল-ফলাদির ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করবো। তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলগণকে, যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে, "আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।" 'এরাতো তারাই, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে আশিস ও দয়া বর্ষিত হয়, আর তারাই সৎ পথে পরিচালিত।"

পবিত্র কোরআন পাঠ শেষ করে ওমর মুখতার পূর্বের স্থানে এসে বসলেন।

ঃ আপনার সময় নষ্ট করার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে সালাত আদায়ের ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য। জারাজায়ানী কিছুক্ষণ স্থির রইলেন। তারপর মুখ খুললেন।

ঃ ওমর মুখতার! আপনি ইতালী সরকারের বশ্যতা স্বীকার করেন না কেন?

ঃ দেশ আমার, মাটি আমার, মানুষ আমার, সেখানে সরকার ইতালীর হবে কিভাবে?

ঃ কেন হতে পারে না?

ঃ রোম আমরা যদি জোর করে দখল করে নিতাম, আপনি বশ্যতা স্বীকার করতেন?

ঃ কিন্তু তবুও আমরা এদেশ শাসন করছি।

ঃ এটিকে শাসন বলবো না অত্যাচার বলবো, উপনিবেশিকরা তো শাসন করে না। শোষণ করে।

ঃ আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আমরা শোষক? কিছুটা রাগতস্বর জারাজায়ানীর কণ্ঠে।

ঃ আমার বলার সেটি কি অপেক্ষা রাখে? আপনি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। প্রশ্নটা নিজের কাছেই করে দেখুন একবার। কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটলো। জারাজায়ানী কিছু ভাবলেন। তারপর বললেন–

ঃ ওমর মুখতার! আপনাকে ক্ষমা করা হতে পারে যদি আপনি সমস্ত মুজাহীদকে অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করতে বলেন।

ঃ ধন্যবাদ জেনারেল। কিন্তু এ কাজ করতে আমার বিবেক ও আমার ধর্ম সমর্থন করে না। আর সব থেকে বড় কথা, এমন কোন কথা ঘোষণা করা হলে মুজাহীদরা তো দূরের কথা, সাধারণ একজন লিবিয় নাগরিক পর্যন্ত তা বিশ্বাস করবে না।

ঃ বিষয়টি আরো একবার ভেবে দেখতে পারেন।

ঃ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

এরপর একটি ফাইল টেনে জারাজায়ানী কয়েকটি সই করলেন। সই করার পূর্বে তিনি ওমর মুখতারকে গভীরভাবে অবলোকন করলেন। তারপর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন।

ঃ ওমর মুখতার! নিঃসন্দেহে আপনি একজন সাহসী বীর পুরুষ। আমার বিশ্বাস, যা ঘটতে যাচ্ছে, তা আপনি বীরত্বের সাথেই গ্রহণ করবেন।

ঃ ইন-শা-আল্লাহ।

## ॥ ২০ ॥

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ সাল। মঙ্গলবার। জারাজায়ানীর অফিসকক্ষ হতে ওমর মুখতারকে আদালত কক্ষে হাজির করা হল। পুরান বারকা-এর পার্লামেন্ট ভবনে এই বিচার কার্যের আয়োজন করা হল।

বিচারের নামে এটি ছিল ইতালীয়দের একটি প্রহসন ও প্রবঞ্চনা। কেননা, বিচার কার্য শুরুর আগেই তাঁর ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করা হয়ে গিয়েছিল। আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ সে বিচারকার্যে ছিল না। আর ফাঁসির নির্দেশ ঘোষণার কয়েক ঘন্টার মধ্যে তার বাস্তবায়ন করা হয়েছিল।

ঘড়িতে তখন ঠিক পাঁচটা বাজে। প্রধান বিচারপতি তার দুজন সহকারী নিয়ে বিচার কক্ষে প্রবেশ করলেন। ওমর মুখতারকে পূর্বেই সেখানে এনে রাখা হয়েছিল। বিচারপতিত্রয় শৃংখলাবদ্ধ ওমর মুখতারের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি দিলেন। তারপর তারা আসন গ্রহণ করলেন।

বিচারকার্য শুরু হলো।

সরকার পক্ষের উকিল দাঁড়িয়ে ওমর মুখতারের বিরুদ্ধে দেশের শান্তি শৃংখলা, দেশের সরকারের বিরোধিতা এবং লুটতরাজ ও ডাকাতির অভিযোগ আনলো। এরপর ওমর মুখতারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান হলো এবং প্রশ্নপর্ব শুরু হলো।

ঃ আপনার নাম?

ঃ ঃ ওমর মুখতার।

ঃ জন্ম?

ঃ ১৮৬২ সাল।

ঃ বয়স?

ঃ সত্তুর।

ঃ মহামান্য ইতালী সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনের নেতা আপনি?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ ইতালী সরকারের বিরুদ্ধে আপনি যুদ্ধ করেছেন?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ আপনি কি নিজে যুদ্ধ করেছেন ও যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ মহামান্য ইতালী সরকার বাহাদুরের বিরুদ্ধে আপনি অস্ত্রধারণ করেছেন?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ রাস্তা তৈরির সময় শ্রমিকদের পাহারা প্রদানকারী সৈনিকদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন আপনি?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ বিয়াটি ওপের নামক দুজন বৈমানিককে আপনি হত্যা করেছেন?

ঃ বন্দীর হওয়ার পর একটি বন্দীশিবিরে তাদের রেখে দিয়েছিলাম। এরপর ইতালী কর্তৃপক্ষকে আমি খবর পাঠিয়েছিলাম। একদিন সেখানে যুদ্ধ বাধে। আমি যেয়ে তাদেরকে মৃত অবস্থায় পেয়েছি। সত্যি কথা বলতে, আমি জানি না কে তাদেরকে হত্যা করেছে।

উল্লেখ্য, ইতালী কর্তৃপক্ষ হতে নুসরাত হারমুস নামের এক ব্যক্তিকে দোভাষী নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। কিন্তু অনুবাদের সময় তার মধ্যে একটা চাঞ্চল্যভাব পরিলক্ষিত হয়। এ জন্য তাকে বাদ দিয়ে লিমারুযু নামের একজন ইহুদীকে দোভাষী নির্দিষ্ট করা হয়।

ঃ ১৯২৯ সাল হতে এ পর্যন্ত আপনি কতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন?

ঃ বলতে পারবো না।

ঃ আপনার কি এরপরও কিছু বলার আছে?

ঃ না।

এবার উকিল বিচারকের দিকে ফিরে বললেন।

ঃ আমার প্রশ্ন করা শেষ ইয়োর অনার! ওমর মুখতার একজন যুদ্ধাপরাধী। মহামান্য ইতালী সরকার বাহাদুরের দেশে সে একের পর এক যুদ্ধের নামে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। অসংখ্য ইতালীয় সৈন্য ও অফিসারদেরকে হত্যা করেছে। দেশের শান্তি শৃংখলা নষ্ট করেছে। ইতালী সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র উঠানোর মত দুঃসাহস দেখিয়েছে। অতএব মহামান্য আদালতের নিকট আমি তার ফাঁসির দাবী করছি।

এরপর ওমর মুখতারের পক্ষে কথা বলার জন্য বিচারকের অনুমতি নিয়ে ক্যাপটেন লুন তানু উঠে দাঁড়াল। ওমর মুখতার তার দিকে তাকালেন। তিনি দেখলেন এ সেই ক্যাপটেন, যাকে তিনি একদিন প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছিলেন। চোখে চোখ পড়তেই ক্যাপটেন লুনতানু চোখ নামিয়ে নিলো। তারপর বলতে শুরু করলো।

ঃ আমি একজন ইতালীয় সৈনিক। যুদ্ধের ময়দানে তাঁকে গুলি করার সুযোগ পেলে আমি তা অবশ্যই করতাম। আমি তাকে অপছন্দ করি ও ঘৃণা করি। তবুও আমি তার পক্ষে কথা বলার জন্য দাঁড়িয়েছি। তিনি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেও আমি মনে করি মূলত তিনি কোন অপরাধ করেননি। নিজের দেশ, জাতি ও সম্পদ রক্ষা করার অধিকার প্রতিটি মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। তিনি সেই দায়িত্ব পালন করেছেন। ক্যাপটেন কথা বলতে বলতে বেশ ইমোশনাল হয়ে পড়লো। চারিদিকে গুঞ্জন শুরু হলো। অনেকে হো হো করে হেসে উঠলো। ক্যাপটেনের সেদিকে খেয়াল নাই। সে বলে চলেছে— নির্বিচারে সাধারণ মানুষ হত্যাকারী

ইতালী সৈন্যদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা নিশ্চয় অন্যায় নয়? অন্যায় নয়– মরুর জেলখানায় অত্যাচারিত মানুষকে মুক্ত ও রক্ষার প্রচেষ্টা করা?

– এবার বিচার কক্ষে তুমুল হট্টগোল শুরু হলো। ক্যাপটেনের উপর সমস্ত আর্মি অফিসারসহ সকলে ক্ষেপে গেল। সরকারী পক্ষের উকিল তাকে বসিয়ে দেবার জন্য বিচারকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ক্যাপটেন গলার স্বর আরো বাড়িয়ে বলে চলেছে।

– অতএব মহামান্য আদালতের নিকট আমি দাবী করবো– সম্ভব হলে তাঁকে নিঃশর্তে মুক্তি দেওয়া হোক। আর তা সম্ভব না হলে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হোক। কিন্তু ফাঁসির মত জঘন্য হুকুম যেন তাঁর উপর দেয়া না হয়। অন্তত তিনি অধিক বয়সের একজন মানুষ– সেদিকটা বিবেচনা করে সেটি করা হোক।

সরকারী পক্ষের উকিল উঠে দাঁড়ালো। তারপর বলতে শুরু করলো।

ঃ বিচারকার্য কোন ইমোশনালের ক্ষেত্র নয় ইয়োর অনার। ক্যাপটেন মূল বিষয় থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন। বয়স বেশি এটি কোন বিষয় নয়। বিষয় অপরাধ। তিনি অপরাধী, এটিই মুখ্য বিষয়। অতএব তার একমাত্র শাস্তি ফাঁসি। ফাঁসিই তার একমাত্র শাস্তি।

বিচারকমণ্ডলী উকিলের কথা সমর্থন করলেন। অতঃপর বিচারক ওমর মুখতারকে জিজ্ঞাসা করলেন।

ঃ আপনার বলার কিছু আছে কি?

ঃ না! মৃদু হাসি তাঁর ঠোটের কোণে। বিচারের নামে এই প্রহসনের কোন প্রয়োজন ছিল না। মনে মনে বললেন ওমর মুখতার।

বিচারকার্য সমাপ্ত হল। তখন ঘড়িতে ঠিক ছয়টা বাজে। বিচারকত্রয় উঠে গেলেন পাশের রুমে। পনের মিনিট পরে আবার তারা ফিরে এলেন। প্রধান বিচারক রায় পাঠ শুরু করলেন।

"ওমর মুখতারের উপর আনিত অভিযোগসমূহ সবই সত্য ও প্রমাণিত। তাই মহামান্য বিচারকত্রয় তাদের সুবিবেচনায় ওমর মুখতারকে ফাঁসির নির্দেশ দিচ্ছে।"

রায় ঘোষণা শুনে ওমর মুখতার শব্দ করে পাঠ করলেন।

"ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন।"

প্রধান বিচারক ওমর মুখতারের কণ্ঠে পবিত্র কোরআনের এই উক্তি শুনে থমকে গেলেন। তিনি দোভাষীকে ডাকলেন। তারপর তার নিকট জানতে চাইলেন।

ঃ ওমর মুখতার কি পাঠ করলো?

ঃ জনাব, তিনি তাদের পবিত্র গ্রন্থ কোরআনের একটি আয়াতাংশ পাঠ করেছেন!

ঃ এ আয়াতাংশের অর্থ কি?

ঃ জনাব, এর অর্থ ভাল করে বোধগম্য করতে হলে তার পূর্ববর্তী আয়াতের বিষয়টি জানতে হবে।

ঃ বলুন আপনি।

ঃ জনাব, এর পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ইসলাম ধর্মে যারা ধার্মিক তাদের উপর ধর্মের কাজ করতে গেলে অনেক সময় মহাবিপদ ও কষ্ট নেমে আসে। আর সে সময় তারা বলে–

"নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁর দিকেই আমরা প্রত্যাবর্তনকারী।"

ওমর মুখতার সে বাক্যই পাঠ করেছেন।

এ কথা শোনার পর সমবেত ইতালীয়দের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। অনেক সামরিক অফিসার বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে ওমর মুখতারের পানে চেয়ে রইলেন। বিচারক দৃষ্টি অবনমিত করলেন। তার চেহারায় অপরাধবোধের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠলো। চেহারা দেখে মনে হলো এ ধরনের হুকুম দিয়ে নিজেকে খুব অপরাধি মনে করছেন তিনি।

## ॥ ২১ ॥

১৬ সেপ্টেম্বর সকাল নয়টা।

ইতিহাসের নৃশংসতম একটি অধ্যায়ের সূচনা ঘটাল ইতালী ঔপনিবেশিক সরকার। পূর্ব থেকেই খোলা ময়দানে ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। সকাল হতেই জোর করে হাজার হাজার লিবীয় নাগরিককে ফাঁসি মঞ্চের চতুর্দিকে জড় করা হলো। পৃথিবীর ইতিহাসে সম্ভবত এই প্রথম হাজার হাজার মানুষের সম্মুখে কোন জননন্দিত নেতাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলান হল। এই ফাঁসি কার্য অবলোকন করানোর জন্য সেদিন ইতালী সরকার প্রায় বিশ হাজার মানুষকে সমবেত করেছিল। দুধের শিশুসহ অশীতিপরায়ণ বৃদ্ধাও ছিল ওই বিশ হাজার মানুষের মধ্যে। কড়া পাহারা চতুর্দিকে। অসংখ্য সৈন্য অস্ত্র হাতে বিশ হাজার মানুষকে নিশ্চুপ রেখেছে। পিনপতন নিস্তব্ধতা। প্রাণপ্রিয় নেতাকে এক নজর দেখার জন্য সকলে উদগ্রীব। তাদের অন্তরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে একটি নাম "ওমর মুখতার, ওমর মুখতার"!! কিন্তু মুখফুটে উচ্চারণ করতে পারছে না।

কড়া প্রহরায় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় অবিসংবাদিত নেতা ওমর মুখতারকে ফাঁসির মঞ্চে আনা হল। তিনি সমবেত জনতার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে অনেকে। অনেকে চোখ মুছছে আস্তিন দিয়ে। অনেকে ঠোঁট কামড়ে কান্না রোধ করার চেষ্টা করছে। অথচ তারা শব্দ করতে পারছে না। ওমর মুখতারের হাত পায়ের বাঁধন খুলে দেয়া হল। ধীরে ধীরে তাঁকে ফাঁসির দড়ির নিকট

আনা হলো। ওমর মুখতার জাল্লাবিয়ার পকেট হতে ছোট মুছহাফটি বের করলেন। ক'মিনিট স্থিরভাবে তিনি পবিত্র কোরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করলেন। তাঁকে এবার ফাঁস লাগানো সিঁড়ির উপর উঠান হল। তিনি সমবেত জনতার উদ্দেশে কটি কথা বললেন, যা সম্মুখে বসে থাকা ব্যক্তিরা ছাড়া কেহ শুনতে পেল না। তিনি বললেন–

"আমরা কখনো আত্মসমর্পণ করবো না। আমাদের পরবর্তী বংশধররাও কখনো অন্যায়ের কাছে মাথা নত করবে না। বীরের ন্যায় মৃত্যুবরণ করা অনেক উত্তম পরাধীনতার জীবন থেকে।"

এরপর ফাঁসের দড়ি তাঁর গলায় পরিয়ে দেয়া হলো।

তিনি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করলেন–

"আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু!"

সমবেত জনতার অনেকে দৃষ্টি অবনত করলো। এ দৃশ্য দেখা যায় না। অনেকে কান্নায় ভেঙে পড়েছে। কষ্টে তাদের বুক ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু ব্যক্ত করতে পারছে না। তারাও মৃদু স্বরে কালিমা শাহাদাৎ পাঠ করছে।

সামরিক অফিসার জল্লাদকে নির্দেশ দিলেন ফাঁসি কার্যকর করতে। অভিনব কায়দায় তৈরি ফাঁসি মঞ্চের একটি চাকা ঘুরাল জল্লাদ। হঠাৎ পায়ের নিচের কাঠ সরে গেল ওমর মুখতারের। শূন্যের উপর ফাঁসিতে ঝুলে রইলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠবীর ওমর মুখতার।

বিশহাজার কণ্ঠের আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে বিশাল ময়দান কেঁপে উঠলো। ইতালী সৈন্যদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার ঘটলো। তাদের আচরণেও সেই ভয়ের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো। ডাক্তার পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিলেন ওমর মুখতার এখনো মরেনি। পুনরায় তাঁকে ফাঁসি দেয়া হলো। জনতার মধ্যে ততক্ষণে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

"আল্লাহু আকবার" ধ্বনিতে বারবার আকাশ বাতাস কেঁপে উঠছে। তাদের সামাল দিতে কয়েক হাজার ইতালী সৈন্যের বেগ পেতে হচ্ছে। সেই সাথে তাদের চেহারায়ও ফুটে উঠেছে ভয়ের ছাপ। সবকিছু দ্রুত করার চেষ্টা করছে তারা।

ডাক্তার পরীক্ষা করে এবার তাঁকে মৃত ঘোষণা করলেন। সাথে সাথে ফাঁসি কাষ্ঠ হতে ওমর মুখতারের পবিত্র দেহ নামিয়ে নেয়া হলো। ঝট্পট পাশে রাখা একটি খালি ট্রাকে উঠানো হলো। স্রোতের ন্যায় জনতা চারদিক থেকে এগিয়ে আসছে। সামরিক অফিসাররাও ঝটপট গাড়িতে উঠে বসলো। গাড়ি ছেড়ে দিল।

জনতাকে সামাল দিতে দিতে সৈন্যরাও এক এক করে গাড়িতে উঠে বসলো।

খালি ফাঁসির মঞ্চ পড়ে রইল। আর নিথর দাঁড়িয়ে রইল বিশ হাজার বেদনা বিধুর নিরীহ মানুষ। তাদের মুখে ভাষা নেই। চোখের অশ্রু শুকিয়ে গেছে। তারা স্বচক্ষে দেখলেও বিশ্বাস করতে পারছে না যে, তাদের প্রাণাধিক প্রিয় নেতা ওমর মুখতার আর নেই। তাদের বিশ্বাস ওমর মুখতার মরতে পারে না। ওমর মুখতার প্রতিটি লিবিয়ার জনগণের অন্তরে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় জীবিত।

মাঠ তখন অনেক খালি হয়ে এসেছে। শাতিলার কোল থেকে আব্দুল্লাহ জোর করে নেমে পড়লো। তারপর এক ফাঁকে ফাঁসির মঞ্চে উঠে এলো। ফাঁসিতে দোল খাওয়া অবস্থায় আস্তিন হতে তাঁর প্রিয় চশমাটি পড়ে গিয়েছিল। আব্দুল্লাহ সেই চশমা উঠিয়ে নিল। শাতিলা দৌড়ে এসে আব্দুল্লাহকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। আব্দুল্লাহ চশমাটি চোখে পরলো।

ঃ দেখতো আম্মা! আমাকে ওমর মুখতারের মত লাগছে না?

ঃ হ্যাঁ বাবা! তোকে ওমর মুখতারের মত দেখাচ্ছে। তুই এ যুগের ওমর মুখতার।

# পরিশিষ্ট

ভয় ভয় ভয়!!

ওমর মুখতারের মৃত্যু ইতালীদের অন্তরে দ্বিগুণ ভয়ের সঞ্চার ঘটাল। সর্বদা একটা গুমোট বাধা আশংকা তাদের মধ্যে বিরাজ করতে শুরু করলো।

বানগাজির সন্নিকটে সিদি ওবাইদি-এর "ছবিরী" কবর খানাতে কালজয়ী এই বীরের লাশ দাফন করা হলো। গভীর কবর খুঁড়ে তার চারধার সিমেন্ট জমিয়ে গেঁথে তোলা হলো। এসব কাজ ইতালী কর্তৃপক্ষ করলো অত্যন্ত গোপনে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তার মাধ্যমে। মাটির উপরাংশে কবরের কোন চিহ্ন রাখা হলোনা, যাতে করে কোন লিবীয় তা চিনতে পারে। এরপর রাখা হলো দীর্ঘদিন ধরে সেখানে কড়া পাহারা। তাদের ভয় ছিল−পাছে কোন মুজাহিদ কবর খুঁড়ে তার মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে যায়।

লিবিয়ার ইতিহাসে শুধু ওমর মুখতার নয়, অসংখ্য মুজাহিদ তাঁর আগে-পিছে এবং সাথে থেকে যুদ্ধ করেছেন, শহীদ হয়েছেন। তবে আর সবার থেকে তিনি ছিলেন কিছুটা ব্যতিক্রম, তার অধীনের প্রতিটি মুজাহিদ ছিল অসীম সাহসের অধিকারী। সাধারণ কমাণ্ডো বাহিনী থেকে অনেক ক্ষিপ্র। মৃত্যুকে তারা মৃত্যু বলে মনে করতো না। ইতালীরা মনে করেছিল ওমর মুখতারের মৃত্যুর সাথে সাথে লিবীয়দের প্রতিরোধ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তবে তারা দেখলো তার উল্টা টি। দীর্ঘ দিন ধরে কালজয়ী এই বীর তার যে উত্তরসূরী রেখে গেছেন তারা কি বসে থাকতে পারে?

ছিটিয়ে থাকা মুজাহিদগণ এক এক করে একত্রে সমবেত হয়ে অল্প ক'দিনের মধ্যেই তারা ইতালী বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারা ওমর মুখতারের যোগ্য উত্তরসূরী শেখ ইউসুফ বুরহীল আল মাস্‌মারীকে তাদের নেতা নির্বাচন করল। ইউসুফ বুরহীল নেতৃত্ব পাওয়ার পর ওস্তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দীর্ঘ চার মাস তিনি যুদ্ধে লিপ্ত রইলেন। এই চার মাসের মধ্যে এমন একদিনও ছিলনা, যে তিনি শত্রুদের সাথে গুলি বিনিময় করেন নি। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অন্যখানে। একেতো গোলা বারুদের অভাব। অভাব গণ যোগাযোগের। তার সাথে যোগ হলো খাদ্যাভাব। ইতালী বাহিনী অতর্কিতে আক্রমণকারী মুজাহিদদের সাথে যখন আর পেরে উঠলো না, তখন তারা বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করলো। তারা অন্য কোন উপায় না দেখে মুজাহিদদের অন্য মানুষ ও দেশের সাথে সমস্ত যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিল। ফলে মুজাহিদগণ অনাহারে দিনাতিপাত করতে লাগলো। যুদ্ধতো দূরের কথা−ক্ষুধার যন্ত্রণায় তারা কোমর সোজা করে পর্যন্ত দাঁড়াতে অক্ষম হয়ে পড়লো। শেষ পর্যন্ত এমন হয়ে দাঁড়াল, পোশাকে তালি দেবার মত কোন কাপড় তাদের কাছে রইল না।

সুতরাং প্রতিরোধ ও আক্রমণ করার ক্ষমতা তারা হারিয়ে ফেললো। তাই ইউসূফ বুরহীল সহ অন্যান্য মুজাহিদ নেতা একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন, যে ভাবেই হোক মিসরে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে।

ইউসূফ বুরহীল, শেখ আঃ হামিদ ও ওসমান আফন্দী–এই তিন নেতা তার দলবল নিয়ে উত্তর দিক দিয়ে এবং দক্ষিণ দিক দিয়ে আরো অনেক মুজাহিদ নেতাকর্মী মিসরের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। উদ্দেশ্য, কাটা তারের বেড়া অতিক্রম করে মিসরে প্রবেশ করা।

তিনদিন পথ চলার পর ওসমান আফন্দি তাদের থেকে পৃথক হয়ে ইতালীদের হাতে আত্মসমর্পণ করলো।

ইতোমধ্যে ইতালীদের নিকট খবর পৌঁছে গেল যে, মুজাহিদ নেতৃবর্গ তাদের ঘাঁটি পাহাড়ী এলাকা ছেড়ে মিসর সীমান্তের দিকে রওনা হয়েছে। প্রথম দিকে তারা এ খবর বিশ্বাস না করলেও উবাইদ গোত্রের নেতা মোহাম্মদ খয়রুল্লাহ ১লা শাবান ১৩৫০ হিজরীতে বন্দী হলে তারা প্রাপ্ত খবরের সত্যতা স্বীকার করলো। ফলে মিসর সীমান্তে কাটা তারের বেড়া বরাবর তারা সৈন্য সমাবেশ ঘটাল। প্রতি একশ মিটার অন্তর তারা একজন করে সৈন্য দাঁড় করাল। সেই সাথে সাজোয়া গাড়ি অনবরত টহল দিতে শুরু করলো।

৪র্থ রাতে তারা মিসর সীমান্তে পৌঁছাল। শুরু হলো যুদ্ধ। অল্পক্ষণেই তাঁরা কাটা তারের বেড়া শত্রুমুক্ত করতে সক্ষম হলো। কিন্তু তা অতিক্রম করতে পারলো না। কেননা, চারিদিক থেকে তখন মৌমাছির মত ইতালী সৈন্য ধেয়ে আসছিল। বাধ্য হয়ে তারা পিছু হঠলো। শেখ আঃ হামিদ পাহাড়ী এলাকায় চলে গেলেও ইউসূফ বুরহীন সেখানে রয়ে গেলেন। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় থাকলেন কাটা তারের বেড়া পাড়ি দেবার। কিন্তু সে অপেক্ষা তার অপেক্ষাই রয়ে গেল। ৯ শাবান ১৩৩০ হিঃ তিনি ইতালীদের হাতে শাহাদাতবরণ করেন।

এই শাহাদাতের সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায় বর্বর ইতালীদের বিরুদ্ধে লিবিয় জনগণের প্রতিরোধের শেষ অবলম্বন। পুরো লিবিয়া ইতালীদের হস্তগত হয়। দীর্ঘ বিশ বছর ধরে তিনি যে মন্ত্র লিবিয়দের অন্তরে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, তা আজো শেষ হয়ে যায়নি। তাঁর শাহাদতের এগারো বছর পর ১৯৪৩ সালে লিবিয়া ইতালীদের করাল গ্রাস হতে মুক্তি লাভ করলেও তাদের ভাগ্যাকাশে অশনি সংকেত বেজেই চলেছে। কিন্তু ওমর মুখতারের যোগ্য উত্তরসূরীরা আজও দমেনি। তারা লড়াই করে চলেছে বীরদর্পে বহুমুখী আগ্রাসনের মোকাবেলায় এবং ঈমান রক্ষার তাগিদে। অচিরেই তাদের ভাগ্যাকাশে নতুন সূর্যের উদয় হবে।

মরুসিংহ

মাসউদ


**প্রকাশক :**
মদীনা পাবলিকেশান্স-এর পক্ষে
**মোস্তফা মঈনউদ্দীন খান**
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

**প্রথম প্রকাশ :**
রবিউস সানী : ১৪২২ হিজরী
শ্রাবণ : ১৪০৮ বাংলা
জুলাই : ২০০১ ইংরেজী

**কম্পিউটার কম্পোজ :**
এস. টি. কম্পিউটার
৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড, ঢাকা-১১০০

**প্রচ্ছদ :**
সরদার জয়নুল আবেদীন

**মুদ্রণ ও বাঁধাই :**
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

**মূল্য : ৭০ টাকা মাত্র**